কাকাবাবু সমগ্র

কাকাবাবু ও এক ছদ্মবেশী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. ভোরবেলা হোটেলের সামনের বারান্দায় 2

২. মণিকরণে এক সময় গুরু নানক এসেছিলেন 15

৩. বিয়াস নদীর ওপর 30

৪. বাংলোর সামনে অনেকখানি বাগান 49

৫. ঠাণ্ডার জন্য বারান্দায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না 63

৬. গাড়িটা ছাড়ল সন্ধে সাড়ে ছটায় 77

৭. কাকাবাবু আর জোজো মুখোমুখি 98

৮. বিদেশি বারোজনের মধ্যে চারজন আহত 115

১. ভোরবেলা হোটেলের সামনের বারান্দায়

ভোরবেলা হোটেলের সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন কাকাবাবু।

বুক ভরে টাটকা বাতাসের শ্বাস নিয়ে বললেন, আঃ! যেন মনে হল, তিনি ফুলের গন্ধ নিচ্ছেন। সত্যি, এখানকার বাতাসে যেন পবিত্র পবিত্র গন্ধ আছে।

ডান পাশেই পাহাড়ের পর পাহাড়। চুড়ায় বরফ জমে আছে। সারাদিন বরফের রং একটু-একটু পালটায়। এখন ভোরের সূর্যের আলোয় বরফের রং লালচে মতন।

সামনের দিকে, রাস্তার ওপারে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতরটা এখনও অন্ধকার। কাছাকাছি কয়েকটা গাছের পাতায় ঝিলমিল করছে রোদ। একটা পাখি এক গাছ থেকে আর-একটা গাছে উড়ে গিয়ে বসল। বেশ বড় পাখি, অনেকখানি ঝোলা লেজ। কাকাবাবু পাখিটা চিনতে পারলেন, ওর নাম ম্যাগপাই। বিদেশে এই পাখি দেখেছেন। এদেশেও যে ম্যাগপাই দেখা যায়, তিনি জানতেন না। ম্যাগপাইয়ের বাংলা কী? বাংলায় এরকম পাখি নেই, তাই বাংলা নামও কেউ দেয়নি।

সন্তু আর জোজো এখনও ঘুমোচ্ছে। কাকাবাবু ওদের ডাকলেন না। হোটেলের একজন বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করল, সার। চা খাবেন?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, আনো। বেশি করে। অন্তত যেন দুকাপ হয়।

একটু পরেই বেয়ারাটি পটে করে চা নিয়ে এল। কাকাবাবু বারান্দায় বসে বেশ তৃপ্তি করে চা খেলেন। শীতের মধ্যে সকালের প্রথম গরম চা-টা খেতে আরাম লাগে বেশ।

অনেকদিন আগে কাকাবাবু চুরুট খেতেন। এখন ছেড়ে দিয়েছেন। এতদিন পর আজ আবার মনে হল, এখন এই ঠাণ্ডায়, একটা চুরুট ধরাতে পারলে বেশ হত!

সেই ইচ্ছেটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়।

কাকাবাবু ওভারকোট পরে আছেন। তবু ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। নাকের ডগাতেই শীত লাগে বেশি। কাকাবাবু নাকটা খানিকক্ষণ ঘষে গরম করে নিলেন। তারপর ক্রাচ বগলে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন সামনের দিকে।

কাছেই একটা ছোট নদী আছে। ছোট হলেও খুব স্রোত। নদীটির নাম পার্বতী। কাকাবাবু ঠিক করলেন, সেই নদীর ধারে বসে থাকবেন কিছুক্ষণ।

শীতের জন্য অনেকেই এখানে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। ভোরের দিকে দুটো কম্বল গায়ে দিতে হয়!

রাস্তায় আর মানুষজন নেই। শুধু দুটি ফরসা তরুণ-তরুণী একটু পরে তাঁর পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল। ওরা বিদেশি। কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় যে দুটো একটা কথা শোনা গেল, তাতে কাকাবাবু বুঝলেন, ওরা ইতালিয়ান।

হিমালয়ের কোলে প্রায় নাম-না-জানা এই ছোট্ট জায়গাটাতেও অনেক বিদেশি আসে বেড়াতে। কেন যেন ইতালি থেকেই ভ্রমণকারীরা এখানে আসে বেশি। অনেকে চার-পাঁচ মাস থেকেও যায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কিছু কিছু বাড়ি রয়েছে, এক-একটা বাড়ি ঠিক সাহেবদের দেশের বাড়ির মতন দেখতে। কোনও কোনও বাড়ি এত উঁচুতে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতেই দম বেরিয়ে যাবে মনে হয়। তবু সাহেব-মেমরা ওইরকম বাড়িই পছন্দ করে।

রাস্তার একপাশে পাহাড়, আর একপাশে পরপর আপেলবাগান। আলাদা আলাদা মালিকরা মাঝে-মাঝে বেড়া দিয়ে রেখেছে। গাছে গাছে আপেল ফলে আছে, এখনও বেশ কচি।

এক জায়গায় নদীতে যাওয়ার পথ। পথ মানে, সেরকমভাবে কেউ তৈরি করেনি, ছোট-বড় পাথর ছড়ানো। এইরকম এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে খুব অসুবিধে হয়। কাকাবাবু সাবধানে হাঁটতে লাগলেন। একটা পাখি সুন্দর শিস দিচ্ছে, সেই পাখিটাকেও তার চোখ খুঁজছে।

পাখিটাকে দেখতে গিয়ে কাকাবাবু আছাড় খেয়ে পড়লেন। তেমন কিছু লাগেনি, কিন্তু লজ্জা পেয়ে গেলেন খুব। কাছাকাছি কোনও বাচ্চা ছেলেমেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই হেসে উঠত। বয়স্ক লোকদের আছাড় খেতে দেখলে সকলেরই। হাসি পায়।

তাড়াতাড়ি উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কাকাবাবু এদিক তাকালেন। কেউ দেখেনি।

তখনই কাকাবাবুর মনে হল, আছাড় খাওয়া কেন বলে? এর মধ্যে খাওয়ার কী আছে? বাংলা ভাষাটা বড় অদ্ভুত। খাওয়া নিয়ে কত কী যে হয়। ভাত খাওয়া আর জল খাওয়া তো আছেই, যদিও ইংরিজিতে ইট আর ড্রিঙ্ক আলাদা। তার ওপর, সিগারেটও খাওয়া হয় কী করে? ধমক খাওয়া? আদর খাওয়া? বুড়োধাড়ি ছেলে মায়ের কোলে শুয়ে খুব আদর খাচ্ছে, লোকে বলে না? এমনকী হাওয়া খাওয়াও বলে।

এইসব ভাবতে ভাবতে কাকাবাবু নদীর ধারে এসে একটা বড় পাথরের ওপর বসলেন।

বসতে না বসতেই একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।

এই রাস্তাটা চলে গেছে মণিকরণের দিকে। সেটা একটা তীর্থস্থান। সেইজন্য দিনের বেলা অনেক গাড়ি যায়। আজ সকালে এটাই প্রথম গাড়ি।

এরকম শান্ত, নির্জন জায়গায় গাড়ির আওয়াজ একেবারে মানায় না। বিশ্রীভাবে নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। ধোঁয়া ছড়ায়।

গাড়িটা খানিকটা এগিয়েই থেমে গেল হঠাৎ। তারপর পিছিয়ে আসতে লাগল। থামল নদীর রাস্তাটার কাছে। গাড়ি থেকে দুটি লোক নেমে হন হন করে, প্রায় দৌড়ে আসতে লাগল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

এরা কারা? বন্ধু, না শত্রু?

অনেক বড় বড় অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছেন কিংবা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন কাকাবাবু। তাদের দলের লোক, চ্যালা-চামুণ্ডাদের তো রাগ থাকবেই তাঁর ওপর। অনেকে অনেকবার প্রতিশোধ নেওয়ারও চেষ্টা করেছে। কে যে কখন কোথা থেকে উদয় হবে। তার তো ঠিক নেই।

কাকাবাবু একবার কোটের পকেট থাবড়ে দেখলেন।

রাত্তিরে ঘুমোবার আগে রিভলভারটা তিনি রাখেন বালিশের তলায়। এখন সকালে বেড়াতে এসেছেন, সঙ্গে সেটা আনেননি। ঘুম থেকে উঠেই কি মারামারি, গুলি ছোড়াছুড়ির কথা কারও মনে পড়ে?

এরা যদি শত্রু হয়, এদের সঙ্গে অস্ত্র থাকবেই। দুজনেরই চেহারা বেশ গাঁট্টাগোট্টা। কাকাবাবু ডান হাতের ক্রাচটা শক্ত করে চেপে ধরলেন।

তারপর ওদের যেন গ্রাহ্যই করছেন না, এইভাবে মুখ ফিরিয়ে নদী দেখতে লাগলেন। এমনও তো হতে পারে, ওরাও আসছে নদীর ধারে বসবার জন্য। কিন্তু তা হলে দৌড়ে দৌড়ে আসবে কেন?

একটা আওয়াজ শুনে কাকাবাবুকে আবার মুখ ফেরাতেই হল।

ওদের মধ্যে একজন আছাড় খেয়ে পড়েছে। একটু আগে কাকাবাবু নিজে আছাড় খেয়েছেন, তবু তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। ওরা তো খোঁড়া নয়, তা হলে আছাড় খাবে কেন?

অন্য লোকটি কাছে এসে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, নমস্কার সার, আপনার নাম কি রাজা রায়চৌধুরী?

কাকাবাবু বললেন, আগে জানতে পারি কি, কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করছেন?

লোকটি বলল, আমরা রাজা রায়চৌধুরীকে খুঁজছি। খুব দরকার। হোটেলে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। একজন বেয়ারা বলল, আপনি এইদিকে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কাকাবাবু বললেন, হোটেলের বেয়ারাটি ঠিক কাজ করেনি। সকালবেলা কেউ বেড়াতে বেরুলে তাকে ডিস্টার্ব করা উচিত নয়। যাই হোক, আপনাদের তো আমি চিনি না, আমার সঙ্গে আপনাদের কী দরকার থাকতে পারে?

অন্য লোকটির আছাড় খেয়ে বেশ লেগেছে। সে একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে এর মধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার সে বলল, এস পি সাহেব আমাদের পাঠিয়েছেন। আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাকে এক্ষুনি মাণ্ডি যেতে হবে।

কাকাবাবুর এবার ভুরু কুঁচকে গেল।

অচেনা উটকো লোকদের বিশ্বাস করা যায় না। এরা পুলিশের বড়কর্তার নাম করছে। সেটা সত্যি কি না কে জানে! অনেক সময় জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার বদলে এরা মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সেবারে কালিকটে মোহন সিং যেরকম জোজোকে সিনেমায় পার্ট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

খানিকটা বিরক্তভাবে কাকাবাবু বললেন, আপনাদের এস পি সাহেবকেও আমি চিনি না। তাঁর কথায় আমাকে মাণ্ডি যেতে হবে কেন? আমার আপাতত এ জায়গাটা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

প্রথম লোকটি বলল, এস পি সাহেব বিশেষ করে বলেছেন, আপনাকে নিয়ে যেতে, গাড়ি এনেছি।

আগেকার দিনে এখানে অনেক ছোট খাটো রাজা-মহারাজা ছিল, তাদের কথাতেই সবকিছু চলত। এখন রাজা-মহারাজাদের দিন শেষ। এখন পুলিশের বড় সাহেবরাই সব দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের সবাই ভয় পায়।

কাকাবাবু কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই অন্যজন বলল, একটা খুব জরুরি কেস আছে, সার। এস পি সাহেব আপনাকে কাজে লাগাবেন। সেইজন্যই মাণ্ডি যেতে হবে আপনাকে।

কাকাবাবু এবার রীতিমতন ধমক দিয়ে বললেন, কেস আছে মানে? আমি তার কী করব? আপনাদের এস পি সাহেব ভুল করেছেন, তাঁকে গিয়ে বলুন!

লোকদুটি কাকাবাবুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু ভাবলেন, এবার বোধ হয় ওরা পকেট থেকে রিভলভার কিংবা ছোরা-ছুরি বের করবে। তিনি তৈরি হয়ে রইলেন।

একজন সত্যিই পকেটে হাত দিল। কিন্তু কোনও অস্ত্রের বদলে বের করল একটা নোটবই। খানিকটা নিরাশভাবে বলল, আপনি যে সার যেতে রাজি নন, সেটা এখানে লিখে দিন।

কাকাবাবু বললেন, কেন, লিখব কেন? আপনারা কি আমার নামে কোনও চিঠি এনেছেন? চিঠি আনলে লিখে উত্তর দিতাম। আপনারা মুখে বললেন, আমিও উত্তর দিলাম মুখে।

লোকদুটি এবার নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে কিছু বলল, তারপর ফিরে গেল গাড়ির দিকে।

কাকাবাবু মনে মনে বললেন, জ্বালাতন! এরা ভাবে কী! কেউ এসে হুট করে কিছু বললেই তার সঙ্গে যেতে হবে? এস পি হোক বা যে-ই হোক।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মনটা খুব ভাল হয়েছিল, এই উৎপাতে খানিকটা খিচড়ে গেছে। মেজাজটাকে আবার প্রসন্ন করার জন্য কাকাবাবু নদীর দিকে মন দিলেন।

ছোট নদী, কিন্তু স্রোতের জন্য বেশ কুলুকুলু শব্দ আছে। বড় বড় পাথরে ঘা খেয়ে খেয়ে বইছে নদী। ওপারের গাছপালার জন্য পাহাড়ের চুড়োগুলো আড়ালে পড়ে গেছে। নদীর জল খুব টলটলে পরিষ্কার!

কাকাবাবু ভাবলেন, আমি তো কবি নই। কোনও কবি এই নির্জন নদীর ধারে বসলে নিশ্চয়ই একটা কবিতা লিখে ফেলত। নদীর সঙ্গে সবাই মিল দেয়, যদি। আর কি কোনও মিল হয়? একটু চিন্তা করতেই মনে পড়ল আর একটা মিল, নিরবধি। আর কোনও শব্দ আছে? আর কিছু মনে পড়ল না।

এর পর তিনি গান ভাববার চেষ্টা করলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটা গান আছে, ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা...। ওঁরই আর একটা গান, ও নদী রে, একটি কথা শুধাই তোমায় বলো না.... ।

কাকাবাবু দ্বিতীয় গানটা গাইতে লাগলেন গুগুন্ করে। তাঁর গলায় ঠিক সুর আসে না। কিন্তু এখানে তো আর ভুল ধরবার কেউ নেই।

ছোটবেলায় তিনি জগদীশচন্দ্র বসুর একটা লেখা পড়েছিলেন। গঙ্গার তীরে বসে বাচ্চা জগদীশচন্দ্র জিজ্ঞেস করতেন, নদী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? নদী উত্তর দিত, মহাদেবের জটা হইতে। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, গঙ্গা নদী নেমেছে স্বর্গ থেকে, কিন্তু

মহাদেবের মাথার বিশাল জটার মধ্যে আটকে গিয়েছিল। ভগীরথ নামে একজন রাজা সেখান থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করে পথ

দেখিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে যান। সেইজন্যই গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী।

এই পার্বতী নদী কোথা থেকে আসছে? নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও পাহাড়ের চূড়ার বরফ থেকে। যদি পা খোঁড়া না হত, তিনি এই নদীর ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে

পাহাড়চূড়ায় উৎসস্থানটা দেখে আসতেন।

খানিকটা বেলা বাড়তেই রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ি চলাচল শুরু হয়ে গেল। কিছু লোক হেঁটে যাচ্ছে। কাকাবাবু উঠে পড়লেন। শীত অনেকটা কমে এসেছে। ওভারকোটটা খুলে ফেলতে হল। ফিরে এলেন হোটেলে।

এই হোটেলে খুব বড় ঘর, সুইট যাকে বলে, তা নেই। তাই দুটো আলাদা ঘর নিতে হয়েছে। জোজো আর সন্তুকে ডেকে তুলবেন ভেবে তাদের ঘরের দরজায় উঁকি মারলেন কাকাবাবু।

জোজো আর সন্তু এর মধ্যে জেগে তো উঠেছেই, খাবার খেতে শুরু করে দিয়েছে। দুজনের সামনের ট্রেতে দুধ আর কর্ন ফ্লেক্স, টোস্ট আর ওমলেট।

জোজো বলল, কাকাবাবু আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আপনাকে ঘরে দেখতে পেলুম না। আমাদের খুব খিদে পেয়েছিল, তাই ব্রেকফাস্ট খেতে শুরু করে দিয়েছি।

কাকাবাবু বললেন, বেশ করেছ।

জোজো জিজ্ঞেস করল, আপনার ব্রেকফাস্ট এখানে দিতে বলব?

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, আমি তো ব্রেকফাস্ট খেতে পারব না। আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

ওরা দুজনেই অবাক হয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, কেন?

কাকাবাবু বললেন, ব্রেকফাস্ট মানে উপবাস ভঙ্গ। আমি তো আগেই চা পান করে ফেলেছি, তাই উপোস ভেঙে গেছে। এখন আমাকে জলখাবার খেতে হবে। আমাদের ছোটবেলায় জলখাবারই বলত, ব্রেকফাস্ট কথাটার চল ছিল না।

জোজো আধখানা ডিম মুখে পুরে দিয়ে বলল, জলখাবার তো বাড়িতে খাই, হোটেলে ব্রেকফাস্ট। এই যে এদের মেনুতে লেখা আছে, ব্রেকফাস্টে কী কী পাওয়া যায়, তার মধ্যে পুরি-তরকারিও আছে!

কাকাবাবু বললেন, কথাটা মেনু নয়, মেনিউ। আমরা বাংলা বাংলা করে নিয়েছি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, ছোট হাজরি ঠিক কী? বিশেষ ধরনের খাবার?

কাকাবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, তুই ছোট হাজরি জানলি কী করে?

সন্তু বলল, একটা পুরনো বাংলা বইতে পড়েছি। একজন সাহেবকে সকালবেলা তার আর্দালি ছোট হাজরি এনে দিচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, আগেকার বইতে থাকত বটে। তোরা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা পড়েছিস? রহস্য লহরী সিরিজ। দারুণ ডিটেকটিভ গল্প। সবই অবশ্য ইংরিজির অনুবাদ। সেই সিরিজের ডিটেকটিভের নাম রবার্ট ব্লেক। আমার খুব ভাল লাগত ওইসব লেখা, এখন আর কেউ বোধ হয় পড়ে না। ওইসব বইতে ব্রেকফাস্টের বদলে লেখা হত ছোট হাজরি। ছোট মানে তো ঠিকই আছে, হারি কেন বলা হত, তা আমি জানি না।

সন্তু বলল, ব্রেকফাস্টের বাংলা, জলখাবার? আর কোনও বাংলা নেই?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, প্রাতরাশ। মানে হল সকালের খাবার। কিন্তু এটা বড় শুদ্ধ বাংলা, লোকের মুখে চলেনি।

জোজো বলল, কাকাবাবু, আপনার জন্য কী প্রাতরাশ অর্ডার দেব?

কাকাবাবু বললেন, তোমরা যা খাচ্ছ তাই-ই। তবে কর্নফ্লেক্স লাগবে না। জোজো উঠে গিয়ে টেলিফোন তুলল। কাকাবাবু চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, সন্তু, তোরা এত তাড়াতাড়ি আরামের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লি যে? আমি নদীর ধারে ঘুরে এলাম। তোরা ঘুমোচ্ছিলি দেখে ডাকিনি।

সন্তু বলল, একটা টেলিফোনের ঝনঝনানিতে ঘুম ভেঙে গেল। বাজছে তো বাজছেই। খুঁজছিল তোমাকে।

কে? নাম বলেনি। বলল, খুব জরুরি দরকার।

আমরা যে এখানে এসেছি, তা তো কারও জানার কথা নয়। কাউকেই খবর দিইনি। গত বছর বিমান বলল, যদি সত্যিকারের নিরিবিলিতে থাকতে চান, তা হলে কসোল-এ গিয়ে কয়েকদিন থেকে আসুন। সত্যিই জায়গাটা বড় মনোরম, আর নিরিবিলিও বটে।

যিনি ফোন করেছিলেন, তিনি তোমাকে না পেয়ে খানিকটা নিরাশ হয়েছেন মনে হল। বোধ হয় তোমার খোঁজে এখানে আসবেন।

এই রে, এইবার মনে হচ্ছে উৎপাত শুরু হবে। নদীর ধারে ও দুটো লোক আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

জোর করে? কারা?

জোর করে, মানে, হাত ধরে টানাটানি করেনি। বলল তো পুলিশের লোক। আসল পুলিশ না নকল পুলিশ তার ঠিক কী! এবার এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।

কাকাবাবু জলখাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলেন। হোটেল থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেই গাড়ি ছুটল মণিকরণের দিকে।

হিমাচলপ্রদেশ ভারতের একটিমাত্র রাজ্য, যার পুরোটাই পাহাড়।

পাহাড়ের পর পাহাড়, তাই রাস্তা কখনও উঁচুতে উঠে গেছে, কখনও নিচুতে। দুদিকের দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। কোনও কোনও পাহাড়ের চূড়ায় বরফ ঝলসে উঠছে রোদ্দুরে, কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে সরু সরু পথ। কত উঁচুতে এক-একটা গ্রাম। কোনও কোনও জায়গায় গ্রাম নেই, একটি বা দুটি বাড়ি রয়েছে চূড়ার কাছে।

রাস্তাটা চলেছে নদীর গা দিয়ে দিয়ে।

গাড়িতে যেতে যেতে নদী নিয়ে কে কটা কবিতা বা গান বলতে পারে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলতে লাগল জোজো আর সন্তুর মধ্যে। সন্তুর অনেক বেশি মুখস্থ থাকে, জোজো তার সঙ্গে পারবে কেন?

হেরে গিয়ে জোজো বলল, শুধু বাংলা-ইংরিজি কেন, অন্য ভাষাতেও নদী নিয়ে অনেক গান আছে। তুই এটা জানিস, লা হিলা হুলা হাপা, গুলগুল টরে টরে, ইয়াগু হামপা...

সন্তু নিরীহ মুখ করে জিজ্ঞেস করল, এটা কী ভাষা?

জোজো বলল, এটা অস্ট্রেলিয়ার একটা আদিবাসীদের গান। বাবার সঙ্গে একবার সেন্ট্রাল অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম তো, সেখানকার এক শহরের মেয়রের ছোট মেয়ের একটা অদ্ভুত অসুখ হয়েছিল, তাকে বাঁচাতে। সেখানে হাপা নামের একটা মজার নদী আছে। সেই নদীটাকে লোকে এত ভালবাসে যে, এই গানটা সবসময় শোনা যায়, ছোট ছেলেমেয়েরাও জানে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, গানটার মানে কী?

জোজো বলল, ওগো হাপা নদী, তোমাকে এত ভালবাসি, তোমার জলে স্নান করে এত আরাম পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোনও নদী সেই আরাম দিতে পারে না।

সন্তু বলল, বাঃ! গানটা আর একবার শোনা তো!

জোজো সুর করে গেয়ে উঠল, লা হিলাহুলা হাপা, গুলগুল টরে টরে, ইয়াপু হাপা...

সন্তুও গাইবার চেষ্টা করে বলল, এর মধ্যে গুলগুল টরে টরে, এই জায়গাটাই আমার বেশি ভাল লাগছে।

জোজো বলল, গুলগুল টরে টরে মানে স্নান করে কী আরাম, স্নান করে কী আরাম! পৃথিবীর সব নদীর তুলনায় ওই নদীতে স্নান করে বেশি আরাম কেন বল

তো?

সন্তু বলল, আমি কী করে জানব? আমি অস্ট্রেলিয়াতেও যাইনি, আর ওই হাপা নদীও দেখিনি।

জোজো বলল, ওই জায়গাটায় খুব শীত, বুঝলি। আর নদীটার জল গরম! শীতকালে চান করার সময় আমাদের গরম জল করে নিতে হয়, ওদের তা দরকার হয় না, নদীতেই গরম জল পেয়ে যায়। পৃথিবীতে আর কোনও নদী আছে, যার জল সারা বছরই গরম থাকে? পাশের দিকে কম গরম, সেখানে চান করে আরাম, আর মাঝখানে বেশি গরম, একেবারে ফুটছে, লোকে কেটলি ভরে সেই জল এনে চা বানিয়ে ফেলে!

সামনের সিটে বসে কাকাবাবু কানখাড়া করে সব শুনছিলেন আর জোজোর গান শুনে মুচকি মুচকি হাসছিলেন। এবার বললেন, জোজো, তোমার ওই গুলগুল টরে টরে নদীই একমাত্র গরম নয়। পৃথিবীর আরও অনেক নদী গরম হতে পারে। এমনকী, এই যে পার্বতী নদী দেখছ, এটাও আমি গরম করে দিতে পারি।

সন্তু বলল, এই তো পাহাড়ি নদী, বরফগলা জল, নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা, কাশ্মীরে যেমন দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, বরফগলা জলও ম্যাজিকে গরম হয়ে যেতে পারে। এই নদীর দিকে ভাল করে তাকিয়ে থাক।

মণিকরণ নামে ছোট্ট শহরটা একেবারে কাছে এসে গেছে। দুপারে অনেক বাড়িঘর। তবু নদীটাকে দেখা যায় গাড়ি থেকে।

কাকাবাবু বললেন, এখন নেমে গিয়ে হাত দিয়ে দেখ!

জোজো অবিশ্বাসের সুরে বলল, যাঃ, কী বলছেন কাকাবাবু!

কাকাবাবু বললেন, ব্রিজের ওপারে নদীর ধারটার দিকে তাকাও তা হলে! এবারে জোজোর চোখ গোল গোল হয়ে গেল। সত্যিই নদীর ওধারে জল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এক জায়গায় জল ফুটছে টগবগ করে।

কাকাবাবু বললেন, এর মধ্যে অবশ্য ম্যাজিক কিছু নেই। কোনও জায়গায় আসবার আগে সেই জায়গাটা সম্পর্কে একটু পড়েশুনে আসতে হয়। এখানে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেখান থেকে গরম জল বেরোয়, সেই গরম জল নদীতে মেশে। এই জায়গাটায় পার্বতী নদীর জল সারা বছরই গরম!

২. মণিকরণে এক সময় গুরু নানক এসেছিলেন

মণিকরণে এক সময় গুরু নানক এসেছিলেন, তাই এটা শিখদের তীর্থস্থান। গুরুদ্বার ও মস্ত বড় অতিথিশালা আছে। এ ছাড়া আছে আরও অনেক মন্দির। অনেক তীর্থযাত্রী আসে, উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করার জন্যও আসে অনেকে। সেইসব লোকের ধারণা, এই গরম জলে স্নান করলে সব অসুখ সেরে যায়।

যেখানে-সেখানে মাটি খুঁড়ে বেরোচ্ছে গরম জল।

এক এক জায়গায় জল এত গরম যে, হাঁড়িতে চাল রেখে দিলে আপনিই ভাত হয়ে যায়।

প্রচুর লোকজন, প্রচুর দোকানপাট।

কাকাবাবু ভিড় পছন্দ করেন না। জায়গাটা এমনি সুন্দর, কিন্তু যেখানে-সেখানে দোকানপাট আর বাড়িঘর গজিয়ে ওঠার জন্য ঘিঞ্জি হয়ে গেছে।

একটুখানি ঘোরাঘুরি করেই কাকাবাবু একটা চায়ের দোকানে বসলেন। দোকানের বাইরে বেঞ্চ পাতা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, দেখা যায় উলটো দিকের পাহাড়।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, জোজো, আমি এখানেই বসছি। তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় তোমরা মন্দিরগুলো দেখে আসতে পারো।

সন্তু বলল, আমরা মণিকরণ ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে যেতে পারি না? ওদিকে কি আরও এরকম জায়গা আছে?

কাকাবাবু বললেন, যতদূর জানি, এদিকে আর কোনও তীর্থস্থান কিংবা বড় জায়গা নেই। রাস্তাটা উঠে গেছে ওপরদিকে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রাম। ঠিক আছে, আমরা ঘুরে আসব খানিকটা। চা খেয়ে নিই।

এখানে চা বানায় পুরোটাই দুধ দিয়ে। দুধের মধ্যে চা-পাতা ফেলে দিয়ে ফোটায়। অন্যরকম স্বাদ। গেলাসে সেই চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন কাকাবাবু।

জোজো বলল, ওইদিকে গরম গরম জিলিপি ভাজছে, সন্তু একটা টেস্ট করবি নাকি?

সন্তু রাজি হয়ে মাথা নাড়ল।

দুখানা করে জিলিপি খাওয়ার পর জোজো বলল, ঠিক স্বাদটা বোঝা যাচ্ছে। আরও দুটো টেস্ট করা দরকার।

জোজো মোট সাতটা জিলিপি টেস্ট করে ফেলল।

তারপর বলল, সন্তু, ওগুলো কীরে, লাড্ডু? টেস্ট করবি নাকি?

সন্তু আর খাবে না। জোজো টেস্ট করল তিনটে লাড্ডু! তারপর চারখানা কচুরি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তুই এত খাচ্ছিস কী করে রে জোজো?

জোজো বলল, মুড এসে গেছে। রোজ কি আর খাই? এক-একদিন খাওয়ার মুড হয়। এখানকার টাটকা বাতাসে খুব খিদেও পাচ্ছে।

সন্তু বলল, অনেক সাহেব-মেম ঘুরছে, তারাও খুব জিলিপি পছন্দ করে দেখছি।

কাকাবাবুর কাছে ফিরে এসে দেখল, কাকাবাবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাস্তার উলটো দিকে। সেখানে একটা বাড়ির দেওয়ালে একটা বড় পোস্টার সাঁটা। একজন বিদেশি

যুবকের ছবির ওপর লেখা—□□□□□□□, □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□. তার তলায় লেখা আছে আরও কিছু।

কাকাবাবু বললেন, ওই পোস্টারে কী লেখা আছে, সব পড়তে পারছি না। তোরা কাছে গিয়ে দেখে আয় তো!

সন্তু পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে সেদিকে চলে গেল।

ফিরে এসে বলল, একজন লোক এখান থেকে হারিয়ে গেছে। তার নাম চার্লস শিরাক। পোস্টারটা লাগিয়েছেন ওর মা। তিনি ছেলেকে খুঁজতে এসেছিলেন এখানে। কোনও সন্ধান পাননি। তাই লিখে দিয়েছেন, কেউ তাঁর ছেলেকে খুঁজে দিতে পারলে তাকে দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেবেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোন দেশের লোক?

সন্তু বলল, কানাডার।

জোজো বলল, দশ হাজার ডলার! অনেক টাকা। খুঁজে দেখব নাকি?

কাকাবাবু বললেন, চেষ্টা করে দ্যাখো না।

জোজো বলল, যদি আমরা খুঁজে দিতে পারি, তা হলে শুধু দশ হাজার ডলার নয়, ওই লোকটির মা নিশ্চয়ই আমাদের কানাডায় নেমন্তন্ন করবে। আমি অবশ্য কানাডায় সাতবার গেছি। সন্তু তো যায়নি।

সন্তু বলল, আমি ডিসকভারি চ্যানেলে কানাডা দেখেছি।

চায়ের দোকানের মালিক গেলাসগুলো নিতে এসে বাংলায় কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, সাহেব কি কলকাতা থেকে আসছেন?

এখানে অনেক বাঙালি ভ্রমণকারী আসে বলে দোকানদাররা কিছু কিছু বাংলা বলার চেষ্টা করে। এই লোকটির উচ্চারণ বেশ পরিষ্কার।

কাকাবাবু বললেন, কলকাতা থেকে এসেছি বটে, কিন্তু আমি তো সাহেব নই, বাঙালি।

লোকটি চওড়াভাবে হাসল।

কাকাবাবু বললেন, এখানে অনেক সাহেব-মেম ঘুরছে। আমাদের আর সাহেব বানাবার দরকার নেই। আপনি এত ভাল বাংলা শিখলেন কোথায়?

লোকটি বলল, আমি সাত বছর কলকাতায় ছিলাম, বড়বাজারে কাজ করেছি। আপনাদের কলকাতাতেও অনেকে অফিসের বাবুদের সাহেব বলে। বড়সাহেব, ছোটসাহেব!

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক! সারা দেশেই এরকম বলে। আপনার দোকান কেমন চলছে? এখানে তো অনেক লোক আসে দেখছি।

লোকটি বলল, শীতকালে তবু কম আসে। গরমকালে এসে দেখবেন, হাজার লোক আসে। বাঙালিও অনেক আসে। শীতকালে সাহেব-মেম আসে বেশি।

লোকটির নাম সুরেশকুমার। মোটাসোটা চেহারা। বেশ গল্প করতে ভালবাসে। তার নিজের বাড়ির উঠোনেও একটা গরম জলের ফোয়ারা মাটি খুঁড়ে উঠেছে, সেই ফোয়ারাটাও সে লোকদের স্নান করবার জন্য ভাড়া দেয়। তাতেও রোজগার হয় ভালই।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, ওই যে সাহেবটির ছবির পোস্টার রয়েছে সামনের বাড়ির দেওয়ালে, ওকে আপনি দেখেছেন?

সুরেশকুমার বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সিরাপসাহেব তো, অনেকবার দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, সিরাপ নয়, শিরাক।

সুরেশকুমার বলল, আমরা বলতাম, সিরাপসাহেব। আমার দোকানে একটা লাল শরবত হয়, সাহেব সেটা ভালবাসত খুব, দিনে তিন-চার গেলাস খেত। একটু পাগলা পাগলা ছিল। একদিন কী কাণ্ড হয়েছিল জানেন? আমার দোকানের ঠিক সামনেই, এই রাস্তার ওপরে হঠাৎ দুটো লোক ওই সিরাপসাহেবকে জাপটে ধরল, জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সিরাপসাহেব প্রথমে ঠিক বুঝতে না পারলেও একটু পরেই গা ঝাড়া দিল, যেন লাফিয়ে উঠে গেল ওপরে, তারপরই দমাদ্দম ঘুসি। খুব ভাল লড়তে জানত, দুটো লোকই মার খেয়ে পালাল।

দুটো লোক ওকে ধরতে এসেছিল কেন?

তা জানি না। তোক দুটো পালাবার পর অনেকে সাহেবকে ঘিরে ধরে ওই কথা জিজ্ঞেস করেছিল। সাহেব কোনও উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার দোকানে ঢুকে এসে বলল, এক গেলাস শরবত দাও!

এ যে দেখছি সিনেমার নায়কের মতন! সেই সাহেব গেল কোথায়?

মরে গেছে নিশ্চয়ই। ছমাস হয়ে গেল, কোনও পাত্তা নেই।

মরে গেছে, তুমি জানলে কী করে?

একদিন কাঁধে ব্যাগ বেঁধে ট্রেকিং করতে চলে গেল। যাওয়ার আগে এই দোকানে বসেছিল। আমায় বলল, এই পার্বতী নদী কোথা থেকে বেরিয়েছে, সেই পাহাড়ের গুহাটা দেখতে যাবে। অনেক সাহেবই তো এরকম যায়। কিন্তু দলবেঁধে যায়। ওই সাহেব গেল একা। কোথায় পা পিছলে টিছলে পড়ে গেছে।

মৃতদেহ পাওয়া গেছে?

নাঃ, তা পাওয়া যায়নি অবশ্য। পুলিশ অনেক খুঁজেছে। মিলিটারি থেকে সার্চ পার্টি গেছে। যাওয়া-আসা ছদিনের রাস্তা, কত পাহাড়ের খাঁজ, কোথায় পড়ে আছে, কে জানে!

সাহেবের মা এসেছিল কানাডা থেকে। কী কান্না! একমাত্র ছেলে! ভদ্রমহিলার এখনও আশা যে, তার ছেলে বেঁচে আছে।

তা হতেও পারে। ডেডবডি যখন পাওয়া যায়নি, হয়তো সাধু হয়ে গেছে।

সন্তু আর জোজো মন দিয়ে শুনছিল। জোজোর পক্ষে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা মুশকিল।

এবার সে বলে উঠল, সাহেবের কুষ্ঠিটা পেলে আমি বলে দিতে পারতাম, বেঁচে আছে কি না!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তুই কুষ্ঠি বিচার করতে পারিস?

জোজো বলল, বাবার কাছে শিখেছি। জন্ম তারিখ জানলে কুষ্ঠি তৈরি করতেও পারি।

সন্তু বলল, ওই পোস্টারে শিরাকসাহেবের মায়ের ঠিকানা লেখা আছে। ওই ঠিকানায় চিঠি লিখে জন্ম তারিখটা জেনে নিতে পারিস।

কাকাবাবু বললেন, আপাতত ওঠা যাক। চলো, একটু গ্রামের দিকে ঘুরে আসি।

সুরেশকুমারের কাছে বিদায় নিয়ে কাকাবাবু ব্রিজটার দিকে এগোলেন। গাড়ি রাখা আছে ওপারে।

জোজো বলল, কাকাবাবু, আমার মন বলছে, চেষ্টা করলে আমরা ওই শিরাক সাহেবকে খুঁজে বের করতে পারব, তা হলে দশ হাজার ডলার রোজগার হয়ে যাবে!

কাকাবাবু বললেন, তুমি আর জোজো চেষ্টা করে দ্যাখো। আমি তো আর পাহাড়ে ওঠাউঠি করতে পারব না!

ব্রিজের এপারে এসে গাড়ির কাছে পৌঁছবার আগেই ঝড়ের বেগে আর-একটা বড় গাড়ি এসে থামল। পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক পরা একজন লোক সেই জিপ থেকে নেমেই দৌড়ে এসে কাকাবাবুকে বলল, আপনিই নিশ্চয়ই রাজা রায়চৌধুরী?

কাকাবাবু মাথা নাড়লেন।

পুলিশটি ইংরিজিতে বলল, আমার নাম অরুণ ভার্গব। আমি এখানকার এস পি। আপনাকে দারুণভাবে খোঁজা হচ্ছে। আপনাকে এক্ষুনি মাণ্ডিতে যেতে হবে।

কাকাবাবু চোয়াল কঠিন করে বললেন, আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। সকালে আরও দুজন লোক এসে আমাকে এই কথা বলেছে। আমি এখানে

বেড়াতে এসেছি। কোথায় যাব না যাব, তা আমি নিজে ঠিক করব। পুলিশের কথামতন আমাকে মাণ্ডু যেতে হবে কেন? আমি দুঃখিত, এই জায়গাটাই আমাদের ভাল লাগছে, মাণ্ডিতে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে এখন নেই।

অরুণ ভার্গব বললেন, ওখানে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেছে। আপনার সাহায্যের খুব দরকার। প্লিজ চলুন।

কাকাবাবু বললেন, আমি আপনাদের কীভাবে সাহায্য করব? আমি পুলিশে চাকরি করি না, চোর ধরা কিংবা খুনের তদন্ত করা আমার কাজ নয়। আমার কাছে

এসেছেন কেন?

অরুণ ভার্গব বললেন, প্লিজ ভাববেন না, আমরা আপনার ওপর জোর করতে এসেছি। খুব বিপদে পড়েই সাহায্য চাইতে এসেছি আপনার কাছে।

কাকাবাবু বললেন, আপনি আমার কথা জানলেন কী করে? আমি তো এখানে কাউকে কিছু খবর দিয়ে আসিনি। আর দেখছেন তো, আমি একজন খোঁড়া মানুষ, আমার কি সাহায্য করার ক্ষমতা আছে?

অরুণ ভার্গব এবার কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, সত্যি কথা বলছি মিস্টার রায়চৌধুরী, আমি আপনার কথা আগে কিছু শুনিনি, এখনও আপনার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। আমার কাছে অর্ডার এসেছে, যেমন করে থোক, বুঝিয়ে সুঝিয়ে আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাণ্ডিতে নিয়ে যেতে হবে। আপনি নরেন্দ্র ভার্মাকে চেনেন?

এবারে কাকাবাবুর ভুরুদুটো সোজা হয়ে গেল। তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনি, নরেন্দ্র ভার্মা আমার বিশেষ বন্ধু।

অরুণ ভার্গব বললেন, নরেন্দ্র ভার্মা এখন সিমলায় আছেন। আমাদের এই বিপদের ব্যাপারটা ওঁকে ফোনে জানানো হয়েছিল। উনিই বলেছেন আপনাকে খুঁজে বের করতে। আপনার সাহায্য আমাদের খুব কাজে লাগবে।

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। এখানে আসবার পথে তিনি দিল্লিতে দুদিন ছিলেন। সেখানে নরেন্দ্র ভার্মার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। নরেন্দ্র ভার্মা অনেকদিনের বন্ধু, একসঙ্গে দুজনে অনেক অভিযানে গেছেন। ওঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করা যায় না।

অরুণ ভার্গব বললেন, চলুন, প্লিজ চলুন, ওখানে ভাল গেস্ট হাউস আছে, আপনাদের থাকাটাকার ব্যাপারে কোনও অসুবিধে হবে না। এখানকার ডিভিশনাল কমিশনার একজন বাঙালি, খুব কাজের লোক, তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে আপনার ভাল লাগবে!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের ওখানে কী হয়েছে?

অরুণ ভার্গব বললেন, গাড়িতে উঠুন। হোটেল থেকে আপনাদের জিনিসপত্রগুলো তুলে নিতে হবে। যেতে যেতে সব বলব।

হোটেলে এসে জিনিসপত্র সব ভরা হল পুলিশের গাড়িতে। ম্যানেজার বিল বানাতে দেরি করছিল, অরুণ ভার্গব তাকে ধমক দিয়ে বললেন, শিগগির, শিগগির করুন। সময় নষ্ট করছেন কেন?

টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে সবাই মিলে ওঠা হল এক গাড়িতে।

নদীটার দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন, জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছিল। খুব ইচ্ছে ছিল, নিরিবিলিতে এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাওয়ার।

অরুণ ভার্গব বললেন, বুঝতেই পারছেন, খুবই একটা বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আপনাকে বিরক্ত করা হচ্ছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা এবার শোনা যাক।

অরুণ ভার্গব বললেন, একটু খুলে বলতে হবে। তবে ব্যাপারটা খুবই গোপন, বাইরের কেউ এখনও কিছু জানে না।

তিনি সন্তু আর জোজোর দিকে তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, ওরা ঠিক আছে। আলাপ করিয়ে দিই, একজন আমার ভাইপো সন্তু, আর একজন তার বন্ধু জোজো। ওদের গুণপনা ক্রমশ জানতে পারবেন।

জোজো বলল, কাকাবাবু, শুধু গুণপনা কেন বললেন? আমাদের কোনও দোষ নেই বুঝি?

কাকাবাবু হাসলেন।

সন্তু বলল, জোজো, আগে ঘটনাটা শুনতে দে!

অরুণ ভার্গব বললেন, পরশুদিন শিবরাত্রির পুজো জানেন নিশ্চয়ই?

কাকাবাবু বললেন, শিবরাত্রি? না, জানতাম না।

অরুণ ভার্গব বললেন, শিবরাত্তিরে এখানে বিরাট মেলা হয়। সেই উপলক্ষে গ্রাম থেকে দেবতারা নেমে আসেন। দূর দূর পাহাড়ের ওপর যেসব গ্রাম, সেখান থেকেও দেবতারা আসেন।

কাকাবাবু খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, দেবতারা নেমে আসেন মানে?

জোজো বলল, দেবতারা কি উড়তে উড়তে আসেন? না, রথে চেপে?

অরুণ ভার্গব বিরক্তভাবে তাকালেন জোজোর দিকে। সন্তু তার কাঁধে চিমটি কেটে বলল, চুপ করে শোন না!

অরুণ ভার্গব বললেন, দেবতা মানে দেবতার মূর্তি। সব গ্রামেই মন্দির আছে, আলাদা আলাদা দেবতা আছেন। এখানে কেউ মূর্তি বলে না, শুধু দেবতাই বলে। মাণ্ডিতে সেই দেবতাদের নিয়ে শোভাযাত্রা হয়। পুরুতরা কাঁধে করে দেবতার সিংহাসন বয়ে নিয়ে যান। অনেক দূর দূর থেকে আসতে হয়, বৃষ্টি হতে পারে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই শিবরাত্রির দু-তিনদিন আগেই অনেক দেবতা পৌঁছে যান। এখানকার মন্দিরে তাঁদের ভাগ ভাগ করে রাখা হয়। প্রায় তিনশোসাড়ে তিনশো দেবতা। এর মধ্যে লাল পাথুরে নামে একটা খুব বড় গ্রামের দেবতার নাম ভূতেশ্বর। খুব জাগ্রত। খুব নাম। সেই ভূতেশ্বর দেবতা চুরি হয়ে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, দেবতা চুরি? শুনতে কীরকম অদ্ভুত লাগে। অর্থাৎ দেবতার মূর্তি চুরি। খুব দামি বুঝি?

ভার্গব বললেন, দামি মানে সোনা কিংবা রুপোর নয়। পঞ্চ ধাতুতে তৈরি। খুব বেশি দামি নয়, আবার শস্তাও নয়। সেজন্য কেউ চুরি করবে না। মূর্তিটা অন্তত আড়াইশো বছরের পুরনো, সেইদিক থেকে দাম আছে, যাকে বলে অ্যান্টিক ভ্যালু। অনেক সময় এইসব মূর্তি বিদেশে পাচার হয়ে যায়। তা ছাড়া, অন্য গ্রামের লোকও চুরি করতে পারে।

জোজো বলল, ভূতেশ্বর মানে কি ভূতদের দেবতা?

কাকাবাবু বললেন, এসব নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে নেই, জোজো। মানুষের বিশ্বাসের ব্যাপার। ভূতেশ্বর মানে শিব। শিবের আর-এক নাম ভূতনাথ।

জোজো বলল, ও হ্যাঁ, তাই তো! আমার এক জ্যাঠামশাইয়ের নামও ভূতনাথ। আমরা বলি, ভুতুজ্যাঠা। খুব ভয় পাই তাঁকে।

ভার্গব এমনভাবে জোজোর দিকে তাকালেন যে, মনে হল, কাকাবাবু না থাকলে এক্ষুনি তিনি জোজোকে একটা চড় কষাতেন।

কাকাবাবু বললেন, দেবতার মূর্তি চুরি গেছে, তাতে আমি কী করব বলুন তো? চোর ধরা তো পুলিশের কাজ। আমি কোনও দিন পুলিশের চাকরি করিনি। চোর কী করে ধরতে হয়, তাও জানি না।

ভার্গব বললেন, মূর্তিটা যে চুরি গেছে, এটাই এখনও কাউকে জানানো হয়নি। জানাজানি হয়ে গেলেই দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে। পুলিশ খোঁজখবর নিতে গেলেই লোকের সন্দেহ হবে। সেইজন্য আমরা এগোতে পারছি না। মাপ করবেন, মিস্টার রায়চৌধুরী। আমি আপনার পরিচয় ঠিক জানি না। আমাদের ওপর অর্ডার এসেছে আপনার সাহায্য নেওয়ার জন্য।

কাকাবাবু বললেন, দেখছেনই তোত আমি খোঁড়া মানুষ। চোরের পেছনে ছোটাছুটি করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

জোজো বলল, কাকাবাবু, একটা কাজ করলে হয় না? এই কেসটা সন্তু আর আমাকে দিয়ে দিন। আমরা ঠিক ভূতেশ্বর ঠাকুরকে খুঁজে বের করে নেব। আমাদের কেউ সন্দেহও করবে না।

ভার্গব চোখ দিয়ে জোজোকে ভস্ম করে দিতে চাইলেন।

কাকাবাবু বললেন, এটা মন্দ প্রস্তাব নয়। তোমরাই চেষ্টা করে দ্যাখো। তোমরা ছোটাছুটিও করতে পারবে।

ভার্গব খুবই অসন্তুষ্টভাবে বললেন, আপনারা প্লিজ ব্যাপারটা হালকাভাবে নেবেন না। এটা সাধারণ চুরির ব্যাপার নয়। এখানকার মানুষ দেবতার মূর্তি ছুতেই সাহস করে না। চোরেরাও মন্দিরে ঢুকতে ভয় পায়। আজ পর্যন্ত এ রাজ্যে কখনও কোনও দেবতার মূর্তি কিংবা কোনও মূর্তির গায়ের গয়না চুরি যায়নি।

কাকাবাবু বললেন, অন্য রাজ্যের লোক এসে চুরি করতে পারে। ভার্গব সাহেব, আপনি বললেন, মূর্তিচুরির কথা এখনও কেউ জানে না। যে পুরোহিতরা মূর্তিটি বয়ে এনেছে গ্রাম থেকে, তারা নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছে?

ভার্গব বললেন, দুজন পুরোহিত শুধু জানে। কিন্তু তারা আর কাউকে জানাতে পারবে না। দুজনকেই খুব কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু পরশুদিন শিব রাত্রির মিছিলে তো অন্য দেবতাদের সঙ্গে ভূতেশ্বরের মূর্তি বের করতেই হবে। হাতে মাত্র দু দিন সময়।

কাকাবাবু বললেন, এই দু দিনের মধ্যে ওরকম আর-একটা মূর্তি বানিয়ে ফেলা যায় না?

ভার্গব বললেন, আড়াই শো বছরের একটা পুরনো মূর্তির সঙ্গে একটা নতুন মূর্তির তফাত বোঝা যাবে না? তা ছাড়া মূর্তিটা ঠিক কীরকম দেখতে, তাও তো আমরা জানি না। ছবি তুলে রাখা হয়নি।

কাকাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, এই রে, মূর্তিটা কী রকম দেখতে, আপনারা জানেন না। আমিও তো জানি না। না জেনে একটা জিনিস খুঁজব কী করে?

ঠিক উত্তর দিতে না পেরে ভার্গব চুপ করে গেলেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, নরেন্দ্র কি সিমলা থেকে আসছে এখানে?

ভার্গব বললেন, হ্যাঁ। সন্ধের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। টেলিফোনে যোগাযোগ রাখছেন আমাদের সঙ্গে।

জোজো বলল, দ্যাখ সন্তু, এখানে পার্বতী নদী আর একটা বড় নদীর সঙ্গে মিশেছে।

সন্তু বলল, এটা বিয়াস নদী। নামটা কী করে হয়েছে জানিস?

জোজো বলল, বিয়াস, মানে বাংলায় আমরা যাকে বলি ব্যাস। ব্যাস নামে একজন ঋষি ছিলেন না? তিনিই তো মহাভারত লিখেছেন।

কাকাবাবু বললেন, ব্যাসদেব মহাভারত লিখেছেন ঠিকই। কিন্তু এই নদীর নাম তাঁর নামে হয়নি।

ভার্গব বললেন, হ্যাঁ, বিয়াস মুনির নামেই এই নদী। এখানেই তাঁর আশ্রম ছিল।

কাকাবাবু বললেন, এখন লোকে তাই ভাবে, কিন্তু এই নামের আসল মানে অন্য। এ নদীর নাম ছিল বিপাশা। সেই বিপাশা থেকে বিয়াস হয়ে গেছে। বিপাশার সঙ্গে ব্যাসদেবের সম্পর্ক নেই। এখানে তো বশিষ্ঠ মুনিরও আশ্রম আছে, তাই না?

ভার্গব বললেন, হ্যাঁ, মানালিতে আছে। এই নদীরই ধারে।

কাকাবাবু বললেন, বশিষ্ঠ মুনিই এই নদীর নাম দিয়েছিলেন বিপাশা। বশিষ্ঠ মুনির একশোটি ছেলেকে এক রাক্ষস মেরে ফেলেছিল। মনের দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করতে চাইলেন। অনেক রকম চেষ্টা করেও তিনি মরতে পারছিলেন না কিছুতেই। শেষকালে তিনি সারা গায়ে দড়ি জড়িয়ে বেঁধে ঝাঁপ দিলেন এক নদীতে। হাত-পা বাঁধা থাকলে তো সাঁতার কাটা যায় না, ডুবে মরতেই হয়। কিন্তু বশিষ্ঠ মুনিকে সবাই দারুণ শ্রদ্ধা করত।

তাই নদীটিও তাকে মরতে দিল না, সেই দড়ির বাঁধন খুলে দিল। পাশ মানে বন্ধন, সেই থেকে নদীর নাম হল বিপাশা। তুই এই গল্পটা জানতিস না সন্তু?

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে আর আমি বলতে গেলাম কেন? তোরই বলা উচিত ছিল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, আমরা বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম দেখতে যাব না?

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়া, আগে ভূতেশ্বরের মূর্তি উদ্ধারের ব্যাপারে কী করা যায় দেখা যাক। নরেন্দ্র যে কী ঝামেলাই চাপাল!

সমস্ত রাস্তাটাই বিয়াস নদীর ধার দিয়ে। আরও ঘণ্টাখানেক পরে ওরা পৌঁছে গেল মাণ্ডিতে।

মাণ্ডি রীতিমতন শহর। নদীর ধারেই বাজার, অনেক হোটেল, কয়েকটা মন্দির আর প্রচুর বাড়ি। ভার্গব অবশ্য ওদের যেখানে নিয়ে গেল, সে জায়গাটা ঘিঞ্জি নয়। একটা ছোট্ট টিলার ওপরে সুন্দর বাগান-ঘেরা একটা সাদা রঙের বাড়ি। সামনে অনেকখানি চওড়া একটা ঢাকা বারান্দা।

এখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। চতুর্দিকে ছোট ছোট টিলা, বরফঢাকা বড় পাহাড় এদিকে নেই।

দূরের কোনও মন্দির থেকে অনবরত ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওরা পৌঁছবার একটু পরেই আর-একটা গাড়িতে চলে এলেন কয়েকজন অফিসার। তাঁদের মধ্যে একজনের বেশ জবরদস্ত মিলিটারির মতন চেহারা। তিনি পুলিশের বড়কর্তা, তাঁর নাম ভূপিন্দার সিং। চুরির ব্যাপারটা বোঝাতে বোঝাতে তিনি এক সময় কাকাবাবুর হাত চেপে ধরে বললেন, মিস্টার রায়চৌধুরী, দেবতার মূর্তিটা খুঁজে বের করার একটা

কিছু উপায় আপনাকে বাতলাতেই হবে। নরেন্দ্র ভার্মা বলেছেন, আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন।

কাকাবাবু বললেন, নরেন্দ্র আমার নামে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে। আগে তো আমি কখনও চোর ধরিনি।

ভূপিন্দার সিং বললেন, চোর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, মূর্তিটা পেলেই হল।

কাকাবাবু বললেন, চলুন, যেখান থেকে মূর্তিটা চুরি গেছে, সেই জায়গাটা আগে দেখে আসি।

ভূপিন্দার সিং বললেন, আমরা তো যেতে পারব না। আমাদের সবাই চেনে। আমাদের ওখানে যেতে দেখলেই লোকে কিছু একটা সন্দেহ করবে। আপনি টুরিস্ট, আপনি মন্দির দেখার ছুতো করে সেখানে চলে যান। ড্রাইভার আপনাকে নিয়ে যাবে। মন্দিরের বাইরে দেখবেন তিনজন গ্রামের লোক বসে আছে। বিড়ি খাচ্ছে, খৈনি খাচ্ছে। তারা কিন্তু আসলে গ্রামের লোক নয়, সাদা পোশাকের পুলিশ। ওই মন্দিরে যাতে এখন আর কেউ যেতে না পারে। তাই ওরা পাহারা দিচ্ছে। আমাদের ড্রাইভার ওকে আপনার কথা বুঝিয়ে দেবে। ভেতরের পুরুত দুজন এখনও ঘুমোচ্ছে। সন্ধের আগে তাদের জাগবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

কাকাবাবু বললেন, তারপর কি ওদের আবার ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন? ওরা খাবেটাবে না?

ভূপিন্দর সিং বললেন, সন্ধের পর কী করা হবে, তা তখন ভেবে দেখা যাবে।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে। তা হলে মন্দিরটা ঘুরে আসা যাক।

৩. বিয়াস নদীর ওপর

বিয়াস নদীর ওপর এখানে কয়েকটা সেতু আছে। নদীর দু দিকেই শহর। অনেক হোটেল হয়েছে।

বাংলোর টিলাটা থেকে নেমে, নদী পার হয়ে যেতে হল উলটোদিকে। শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় আর-একটা টিলার ওপর সেই মন্দির। খুবই ছোট মন্দির, শুধু পাথরের দেওয়াল, রং-টংও করা নেই। মন্দিরের সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, সেইখান থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে মন্দিরের দরজা পর্যন্ত।

গাড়িটা এসে সেই ফাঁকা জায়গাটায় থামল।

দুজন লোক সিঁড়ির ওপর বসে বিড়ি টানছিল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুদের দিকে চেয়ে রইল তীক্ষ্ণ চোখে। গাড়ির ড্রাইভার এগিয়ে গেল আগে আগে। সে লোকদুটির সঙ্গে কথা বলে সব বোঝাতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, তুই আর জোজো আগে উঠে যা। আমার তো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সময় লাগবে।

সন্তু বলল, আমরাও আস্তে-আস্তে উঠছি তোমার সঙ্গে।

কাকাবাবু বললেন, না, আমার পাশে থাকতে হবে না। তোরা এগিয়ে যা। পাহারাদারদের একজন সন্তুদের নিয়ে গেল ওপরে, আর একজন রইল কাকাবাবুর সঙ্গে।

উঁচু উঁচু সিঁড়ি, ক্রাচ নিয়ে উঠতে কাকাবাবুর অসুবিধে হচ্ছে। পেছনে যাতে না যায় সেজন্য তিনি সাবধানে ক্রাচ ফেলছেন। পাহারাদারটি তাঁর হাত ধরতে এলে তিনি হিন্দিতে বললেন, আমাকে সাহায্য করতে হবে না। আমি নিজেই উঠতে পারব। আরও তো অনেক লোক মন্দির দেখতে আসতে পারে, তাদের আপনারা আটকাচ্ছেন কী করে?

পাহারাদারটি বলল, আটকাচ্ছি না। মন্দিরের বাইরের দরজায় তালা দেওয়া আছে। তাই দেখে লোকেরা এসেও ফিরে যাচ্ছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এই মন্দিরে তো অন্য দেবতাও আছে, তাই না? সেই দেবতার পুজো হয় না? এখানকার স্থানীয় লোক যারা এই মন্দিরে পুজো করে, তারা আসে না?

পাহারাদার বলল, এ মন্দিরে শুধু শনি আর মঙ্গলবার পুজো হয়, অন্যদিন কেউ সাধারণত আসে না। পরশু শনিবার।

আশপাশের গ্রাম থেকে কত দেবতার মূর্তি এসেছে?

তিনশোর বেশি। বড় বড় মন্দিরগুলোতে একসঙ্গে অনেক দেবতা রাখা হয়। এই মন্দিরে শুধু একটিই ছিল। ভূতেশ্বর দেবতা।

এর আগে কখনও দেবতা চুরি গেছে?

কোনওদিন শুনিনি।

এই ভূতেশ্বর দেবতা কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?

কাল দুপুর থেকে। তার আগেও হতে পারে। দেবতা পৌঁছেছেন আগের রাতে। যে দুজন পুরুত সঙ্গে থাকে, তারা ভাঙ খেয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। রাত্তিরে দেবতার যাতে শীত না লাগে তাই গায়ে একটা কম্বল চাপা দেওয়া থাকে। সকালে ওরা কম্বল তুলে দেখেনি। দুপুরে ওরা কম্বল সরিয়ে দেবতাকে খাবার দিতে গিয়ে দেখে, সেখানে দেবতা নেই। রয়েছে একটা পাথর।

তারপর কী হল?

প্রথমে ওরা বোঝেনি যে, দেবতা চুরি গেছে। ওরা ভেবেছিল, দেবতা ইচ্ছে করে পাথরের রূপ ধরেছেন। সেই পাথরকেই পুজো করতে লাগল। খাবার দিল। তারপর ওদের একজন এই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল, সব লোগ শুনো, শুনো, ভূতেশ্বর দেওতা পাথর বয়া। এদের এমনই বিশ্বাস, এরা ভাবতেই পারে না যে, দেবতা চুরি হতে পারে। তাই ভেবেছে, এটা দেবতারই লীলা।

তার মানে অনেক লোক জেনে গেছে?

খুব বেশি লোক জানেনি। দুপুরে বেশি লোক তো থাকে না। দু-চারজন শুনে সেই পাথর দেখেও গেছে। তারা খুব অবাক হয়নি। পাথরও তো দেবতা হয়। খবরটা খুব তাড়াতাড়ি থানায় পৌঁছে যায়। থানার বড়বাবু সঙ্গে-সঙ্গে এখানে চলে এসে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। তিনি পুরুত দুজনকে আর বেরুতে দেননি। তাদের সঙ্গে এক ঘণ্টা সময় কাটান। তাদের বোঝান যে, দেবতা ইচ্ছে করে পাথর হয়েছেন। আবার শিবরাত্রির মেলায় আগে নিজের রূপ ধরবেন। এরকম দেখাও একটা পুণ্যের কাজ। সেই উপলক্ষে অনেক খাবারদাবার আনালেন, পুরুতদের সঙ্গে নিজেও খেলেন। শুধু পুরুতদের শরবতে খুব কড়া ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল। তারা এখনও জাগেনি।

থানার বড়সাহেব খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন তো! এখন শেষ রক্ষা হলে হয়!

আপনি সার কোথা থেকে আসছেন? আপনি কি সেই মূর্তি উদ্ধার করতে পারবেন?

কাকাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, চোর ধরার কোনও মন্ত্র আমি জানি। আপনাদের বড়সাহেব জোর করে আমাকে ধরে এনেছেন। দেখা যাক, কী করা যায়!

মন্দিরটার বাইরে একটা দেওয়াল, তার মাঝে-মাঝে ভাঙা। ভেতরে খানিকটা চত্বর। মন্দিরের সামনে একটা চৌকো রক, তাতে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোচ্ছে দুই পুরোহিত। নাক ডাকার পাল্লা দিচ্ছে।

ভেতরটা খুবই ছোট, অন্ধকার মতন। মাঝখানে একটা শিবলিঙ্গ। সেটাই এই মন্দিরের দেবতা। তার পাশে একটা বেশ বড় পাথর, এবড়োখেবড়ো মতন, কোনওরকম মূর্তি বানাবার চেষ্টাই নেই। দেখলেই মনে হয়, পাহাড়ের গা থেকে কুড়িয়ে আনা। ভূতেশ্বরের মূর্তির বদলে চোরেরা ওই পাথরটা রেখে গেছে।

কাকাবাবু ভেতরে এসে পাথরটা একবার শুধু ঠেলা দিয়ে দেখলেন। আর কিছুই দেখার নেই।

সন্তু আর জোজো তখন মন্দিরটার পেছনদিকে এসে শহরের দিকে তাকিয়ে আছে। এখান থেকে বিয়াস নদী অনেক নীচে, রাস্তা দিয়ে বাস আর ট্রাক যাচ্ছে, খেলনার মতন মনে হয়।

কাছে এসে কাকাবাবু বললেন, বেশ মজার ব্যাপার, তাই না? যে দুজন পুরুত ভূতেশ্বরের মূর্তিটার সঙ্গে ছিল, তারা এমন ঘুমোচ্ছে যে, সন্ধের আগে জাগবেনা। তাদের কোনও কথা জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। ভূতেশ্বরের মূর্তিটা আমরা দেখিনি, এরাও কেউ ঠিক ঠিক বর্ণনা দিতে পারছে না। তা হলে সে মূর্তি আমরা খুঁজে বের করব কী করে, কিংবা চোরদেরই বা ধরার উপায় কী?

জোজো বলল, আমি লক্ষ করে দেখেছি, কারও পায়ের ছাপও নেই। পাথুরে জায়গা তো!

কাকাবাবু বললেন, পুরুতরা আসে, পুলিশের লোক এসেছে, আরও অন্য লোক এসেছে। পায়ের ছাপ থাকলেই বা কী হত?

জোজো বলল, ইস, কম্পাসটা যদি নিয়ে আসতুম, কোনও সমস্যাই ছিল না।

সন্তু বলল, কম্পাস? কম্পাস দিয়ে কী হত?

জোজো বলল, গ্রিসের একজন বিশপ বাবাকে একটা অদ্ভুত ধরনের কম্পাস উপহার দিয়েছেন। সেটা হাতে থাকলে কী হয় জানিস? কম্পাসটা যদি ওই পাথরটার গায়ে

একবার ছোঁয়াতুম, তা হলেই কম্পাসটা কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিত, যে পাথরটা এনেছে, সে এখন কোথায় আছে। একবার গ্যাংটকে আমাদের হোটেলের ঘর থেকে বাবার একটা ঘড়ি চুরি গেল। সেই ঘড়িটা দিয়েছিলেন জাপানের সম্রাট, তাই বাবার খুব প্রিয়। আরও কিছু টাকাপয়সা, জিনিসপত্র চুরি গিয়েছিল, কিন্তু ঘড়িটাই আসল। চোরটা ঘরের শুধু একটা পোড়া দেশলাইকাঠি ফেলে গিয়েছিল। সেই আধখানা কাঠি ছোঁয়ানো হল কম্পাসটাতে। অমনি সেটা টিক টিক শব্দ করে উঠল। তারপর সেটা নিয়ে এগোতে হয়, ভুল দিকে গেলেই শব্দটা থেমে যায়। শব্দটা শুনতে শুনতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমি চলে এলাম বাসডিপোতে। সেখানে পাঁচখানা বাস দাঁড়িয়ে। এক-একটা বাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, অমনই আওয়াজটা থেমে যায়। তাতে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম, এর পর কী করব! চতুর্থ বাসটার দরজার কাছে আসতেই টিক টিক শব্দটা খুব জোর হয়ে গেল। তারপর যা হল। তুই হয়তো শুনলে বিশ্বাস করবি না, কিন্তু একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। বাসে তিন-চারজন লোক মোটে বসে ছিল। আমি উঠতেই কোণ থেকে একজন লোক হাউমাউ করে বলে উঠল, আমি ঘড়ি দিয়ে দিচ্ছি, সব দিয়ে দিচ্ছি, আমাকে দয়া করে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন না!

সন্তু অম্লান মুখে বলল, বিশ্বাস করব না কেন? পুরোটা বিশ্বাস করেছি।

কাকাবাবু বললেন, সেই জাদুকম্পাস থাকলে তো সব ঝামেলাই মিটে যেত বুঝতে পারছি। সেটা যখন নেই, তখন এ চোরদের ধরার কোনও উপায় তোমরা বলতে পারো? আমার বুদ্ধিতে কুলোবে না বুঝতে পারছি!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, তুমি চোরদের বলছ কেন? একটা চোরও তো হতে পারে?

কাকাবাবু বললেন, এই ধরনের চুরির পেছনে সাধারণত একটা দল থাকে। তা ছাড়া, ওই পাথরটা আমি নেড়েচেড়ে দেখেছি, একজন লোকের পক্ষে ওটা বয়ে

আনা সম্ভব নয়।

জোজো ফস করে জিজ্ঞেস করল, দুপুরে আমরা কী খাব?

সন্তু ভুরু তুলে বলল, হঠাৎ খাবার কথা? এর মধ্যে তোর খিদে পেয়ে গেল?

জোজো বলল, খিদে পাবে না? দুপুর আড়াইটে বাজে। না খেয়েদেয়ে আমরা চোরের পেছনে ছুটতে যাব কেন?

কাকাবাবু বললেন, তা অবশ্য ঠিক। এখানে অপেক্ষা করেও কোনও লাভ নেই। সন্ধেবেলা পুরুত দুজন জেগে উঠলে ওদের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

জোজো বলল, তার মধ্যে নরেন্দ্র ভার্মা এসে পড়বেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলুন। চোর ধরার মতন সামান্য কাজ আপনাকে মানাবে না।

কাকাবাবু বললেন, চলো, বাংলোতে ফেরা যাক।

ফেরার পথে অন্য একটা সেতুর কাছে এসে গাড়িটা থেমে গেল। এই সেতুটা পুরনো। একসঙ্গে দুদিকের গাড়ি যেতে পারে না। দুদিকে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে, তারা এক-একবার এক একদিকের গাড়ি ছাড়ে।

উলটোদিক থেকে একটা গাড়ি আসছে, তাতে ড্রাইভার ছাড়া আর কোনও লোক নেই। ড্রাইভারটির দিকে তাকিয়ে কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি সন্তদের জিজ্ঞেস করলেন, তোরা এই লোকটিকে চিনিস?

এখানকার স্থানীয় লোকদের মতন লোকটির মাথায় সাদা রঙের মস্ত পাগড়ি। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, ডান হাতে একটা লোহার বালা।

সন্তু বলল, না, একে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না!

কাকাবাবু বললেন, আমার যেন মনে হচ্ছে, কোথাও একে দেখেছি আগে।

জোজো বলল, মনে হচ্ছে, মোহন সিং-এর কোনও চ্যালা। কালিকটে যখন আমাদের আটকে রেখেছিল, তখন এই লোকটাই খাবার দিতে আসত না?

সন্তু বলল, যাঃ, সে-লোকটার তো মাথায় টাক ছিল। মুখে দাড়ি-গোঁফও ছিল না।

জোজো বলল, এক বছরে দাড়ি-গোঁফ গজানো যায়। টাকও ঢাকা যায় পরচুলা দিয়ে।

সন্তু বলল, এক বছরে কি বেঁটে মানুষকে লম্বা করা যায়? সেই লোকটা ডেফিনিটলি এর চেয়ে বেঁটে ছিল।

জোজো বলল, হ্যাঁ, লম্বা হওয়াও যায়। আমার বাবার কাছে তিব্বতি ওষুধ আছে। তিব্বতের লোকরা সবাই কীরকম লম্বা হয় দেখিসনি? বাবা সেই ওষুধ

অবশ্য যাকে তাকে দেন না।

সন্তু বলল, তা হলে তুই সেই ওষুধ খেয়ে লম্বা হচ্ছিস না কেন?

জোজো বলল, আমার একুশ বছর বয়েস হোক, দেখবি আমি তোর চেয়ে অন্তত ছ সেন্টিমিটার বেশি লম্বা হয়ে গেছি।

কাকাবাবু চিন্তিত মুখে বসে রইলেন চুপ করে।

বাংলোতে এখন আর কোনও পুলিশ নেই। একজন চৌকিদারকে দেখে জোজো চেঁচিয়ে বলল, খানা দিজিয়ে জলদি! বহুৎ ভুখ লাগ গিয়া।

কাকাবাবু বললেন, আমি স্নানটা সেরে আসি চট করে। তোমরা স্নান করবে না? দুটো বাথরুম আছে।

জোজো বলল, আকাশে মেঘ জমেছে। মেঘলা দিনে স্নান করলে আমার গলায় ব্যথা হয়।

কাকাবাবু বললেন, গরম জল তো পেতে পারো।

জোজো বলল, গরম জলে স্নান করতে হয় ভোরবেলা। দুপুরবেলা আমার ঠিক সহ্য হয় না।

কাকাবাবু স্নান সেরে এসে দেখলেন, সন্তুর তখনও হয়নি, জোজো একলাই খাবার টেবিলে বসে আছে। টেবিলে তিনটে প্লেট ও জলের গেলাস সাজানো, খাবার তখনও দেয়নি। শুধু একটা প্লেট-ভর্তি স্যালাড। জোজো তার থেকেই পেঁয়াজ আর শসা খেতে শুরু করেছে। বেচারির খুবই খিদে পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

একজন পরিচারক এসে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, সার, আপনারা কি ঝিঙে-পোস্ত খান? আপনাদের জন্য রান্না করেছি। ঝিঙে এখানে সহজে পাওয়া যায় না।

লোকটির মুখে বাংলা কথা শুনে কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বাঙালি নাকি?

লোকটি বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ সার, আমার নাম নৃপেন হালদার।

কাকাবাবু বললেন, আপনার বাড়ি এখানেই?

নৃপেন বলল, না সার, আমার বাড়ি হুগলি জেলায়। চাকরিবাকরি পাইনি, তাই ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি। আমি এই বাংলোর ইনচার্জ, রান্নাও করি।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, বাঙালির ছেলে এতদূরে এসে চাকরি করছেন, এ তো বেশ ভাল কথা। তা এখানে আপনার ভাল লাগছে তো?

নৃপেন বলল, এমনিতে তো সবই ভাল। লোজনেরাও ভাল, তবে কী জানেন সার। দিনের পর দিন বাংলায় কথা না বলতে পারলে বুকটা যেন শুকিয়ে যায়!

কাকাবাবু বললেন, এখানে আর বাঙালি নেই বুঝি?

নৃপেন বলল, শুনেছি, আছে আরও পাঁচ-ছ জন। দেখা তো হয় না। এখানকার কমিশনার সাহেবই তো বাঙালি, মিস্টার সুদৃপ্ত রায়, মস্ত বড় অফিসার, তিনি অবশ্য এখন এখানে নেই, দিল্লিতে কী কাজে গেছেন শুনেছি।

জোজো অধৈর্য হয়ে বলল, আমরা ঝিঙে-পোস্ত খাই, সব খাই। ভাত-রুটি কী আছে আগে আনুন তো!

নৃপেন টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে দিল। অনেকরকম খাবার। ভাত-রুটি, ডাল, ঝিঙে-পোস্ত, মাছভাজা, মুরগির ঝোল।

সন্তু এর মধ্যে এসে যোগ দিয়েছে।

নৃপেন দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। কাকাবাবু খেতে খেতে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে চুরি-ডাকাতি কেমন হয়?

নৃপেন বলল, না সার, চুরি-ডাকাতি খুবই কম। খুব শান্ত জায়গা।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, আমাদের দেশে এরকম জায়গা তো কমই আছে। এখানে শিবরাত্রির দিন খুব বড় মেলা হয়, তাই না? দেবতাদের মিছিল হয়। আপনি দেখতে যাবেন নিশ্চয়ই?

নৃপেন বলল, তা তো যাবই। সার, আমি সবুজ দ্বীপের রাজা সিনেমাটা দেখেছি। যখনই শুনলাম, এখানে রাজা রায়চৌধুরী আসছেন, তখনই বুঝেছি, আপনিই কাকাবাবু। এখানে কি কোনও রহস্য সমাধানে এসেছেন?

কাকাবাবু বললেন, না, না। শিবরাত্রির মিছিল দেখতে এসেছি।

নৃপেন জিজ্ঞেস করল, এই দুজনের মধ্যে সন্তু?

সন্তু মুখ নিচু করে জোজোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে ও!

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, আমি নয়, ও!

কাকাবাবু নৃপেনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বুঝি জোজোর কথা শোনোনি? সন্তুর বন্ধু।

নৃপেন আর কিছু বলার আগেই একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। সবাই তাকাল সেদিকে।

গাড়ি থেকে নামলেন নরেন্দ্র ভার্মা। লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, সুট-টাই পরা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমাটা নতুন।

ধপ ধপ করে জুতোর শব্দ তুলে সরাসরি খাওয়ার ঘরে চলে এসে তিনি বললেন, ইস, সব খেয়ে ফেললে? আমার জন্য কিছু রাখোনি?

কাকাবাবু বললেন, অনেক আছে, এসো, বসে পড়ো নরেন্দ্র!

নরেন্দ্র বললেন, না, আমার খুব খিদে পেয়েছিল, রাস্তায় একটা পাঞ্জাবি ধাবাতে খেয়ে নিয়েছি। অনেকটা পথ গাড়িতে আসতে হয়েছে।

তারপর জোজো-সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যালো, ইয়াং ডেভিল্স, তোমরা কেমন আছ? জোজো, নতুন নতুন গল্প জমেছে?

জোজো বলল, অনেক! নৃপেন জিজ্ঞেস করল, সার, দই খাবেন তো? আর মিষ্টিও আছে।

কাকাবাবু বললেন, নাঃ, দই-মিষ্টি আর এখন খাব না। গুরুভোজন হয়ে গেছে। জোজো যদি ইচ্ছে করে তো খেতে পারে।

জোজো বলল, দই খাব না, মিষ্টি টেস্ট করে দেখতে পারি। নরেন্দ্র বললেন, এই লোকটি কি বাঙালি নাকি? এখানেও একজন বাঙালি জুটিয়েছ?

কাকাবাবু হেসে বললেন, বাঙালি কোথায় নেই! সারা ভারতের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

জোজো বলল, তেনজিং আর হিলারি যখন প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় ওঠে, তখন দেখে যে, আগে থেকেই সেখানে কয়েকজন বাঙালি বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

নরেন্দ্র বললেন, ইতিহাসে এই কথাটা লিখতে ভুলে গেছে, তাই না? চলো, হাত ধুয়ে নাও। আমরা অন্য ঘরে বসে কথা বলব।

সবাই মিলে বসা হল কাকাবাবুর ঘরে। নরেন্দ্র দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

কাকাবাবু এবার মেজাজের সঙ্গে বললেন, কী ব্যাপার বলো তো নরেন্দ্র? আমাকে কি একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না? দিব্যি ছিলাম কসোল নামে একটা ছোট্ট জায়গায়, সেখান থেকে আমাদের ধরে আনাল? এখানে এসেই বা আমরা কী করব? চোর ধরা কি আমাদের কাজ? পুলিশগুলো সব অপদার্থ?

নরেন্দ্র মিটিমিটি হেসে শান্তভাবে বললেন, তুমি এলে কেন? ওদের না বলে দিলেই পারতে।

কাকাবাবু বললেন, আসতে চাইনি, ওদের অনেকবার না বলেছিলাম। তারপর তোমার নাম করে অনুরোধ জানাল। তোমার নাম শুনে তো আর ঠেলতে পারি না।

নরেন্দ্র এবার হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে বললেন, জানতাম। আমার নাম শুনে তুমি আসবেই। তুমি বাই চান্স কাছাকাছি রয়েছ, অথচ তোমার সাহায্য পাব না, এ কখনও হয়?

কিন্তু এখানে চুরির ব্যাপারে আমি কী সাহায্য করব?

বুঝতেই পারছ, এটা সাধারণ চুরি নয়। দেবতার মূর্তি চুরি। কালকের মধ্যে মূর্তিটা উদ্ধার করতে না পারলে দারুণ গোলমাল হবে। দাঙ্গা লেগে যেতে পারে। এর মধ্যে জানাজানি হলেও বিপদ। তাই পুলিশকে এত সাবধানে চলতে হচ্ছে।

শোনো নরেন্দ্র, সাধারণ মানুষ পাপের ভয়ে দেবতার মূর্তিকে ছুঁতেই সাহস করে না, চুরি করা তো দূরের কথা। কিন্তু যারা চোরা কারবার করে, তাদের ওসব পাপের ভয়টয় নেই। ওরা বিদেশে অনেক পুরনো মূর্তি পাচার করে দেয়। সেইরকম কোনও দলের খবর পুলিশ রাখে না? তাদের ধরে জেরা করো। আমি খোঁড়া মানুষ, আমি তো আর দৌড়োদৌড়ি করতে পারব না?

এখানে এরকম ঘটনা আগে ঘটেনি। আসলে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ কিংবা কর্নাটকে কত বড় বড় মন্দির, প্রচুর ভাল ভাল মূর্তি, ওসব জায়গা থেকে কিছু মূর্তি চুরি যায়। কিন্তু এখানে অত বড় কিংবা পুরনো মন্দির নেই, তেমন কিছু দামি মূর্তিও নেই। তাই চোরাকারবারিদেরও এদিকে নজর পড়েনি। মনে হচ্ছে, মূর্তি চুরি করে কেউ কিছু একটা গোলমাল পাকাতে চাইছে।

আমার কাছে তোমরা কী সাহায্য আশা করো। মূর্তিটা কেমন দেখতে তাই-ই জানি না।

কয়েকটা ছবি জোগাড় হয়েছে শুনেছি। গত বছরের মেলার সময় তোলা। ছবিগুলো খুব পরিষ্কার নয়, তবু একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। একটু পরেই একজন ছবিগুলো নিয়ে আসবে এখানে।

সেই ছবি দেখে আর একটা দেবতার মূর্তি বানিয়ে নাও। এখন তো ঝাট মিটুক। আসল মূর্তি পরে খুঁজো।

এত তাড়াতাড়ি পঞ্চ ধাতুর মূর্তি গড়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া পুরনোর সঙ্গে নতুনের তফাত বোঝা যাবেই। মেলার দিন এরা ফুল আর চন্দন দিয়ে মূর্তিটাকে সাজায়।

পুরুত দুজনকে তোমরা কতক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখবে? তিন দিন ধরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা সম্ভব নাকি? যদি ওরা মরে যায়?

না, একটা অন্য ব্যবস্থা হয়েছে। ওদের তুলে নিয়ে রাখা হবে একটা নার্সিং হোমে। ওদের অসুস্থ সাজিয়ে চিকিৎসা করানো হত, ওখান থেকে বেরুতে পারবে না। আর দুজন লোককে পুরুত সাজিয়ে পাঠানো হবে ওই মন্দিরে।

সেই গ্রামের আর অন্য লোক নেই? তারা মূর্তিটা দেখতে আসবে না? অন্য পুরুতদের দেখে সন্দেহ করবে না?

লালপাথর গ্রামটা অনেক দূরে। দেবতার মূর্তি নিয়ে পুরুতরা অনেক আগে চলে আসে। আর গ্রামের লোক মেলা দেখলে আসবে ওইদিন সকালে কিংবা আগের রাতে। এর মধ্যে কেউ এসে পড়লে বলা হবে, মূর্তি ঢেকে রাখা আছে। কোনওরকমে ম্যানেজ করতে হবে আর কী?

নরেন্দ্রর কোটের পকেটে এই সময় কুরুরুং কুরুরুং শব্দ হল। তিনি একটা মোবাইল ফোন বের করে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগলেন হিন্দিতে।

কথা শেষ করে বললেন, ছবিগুলো নিয়ে আসছে ভূপিন্দার সিং। আর একজন লোক পাহারাদারদের ফাঁকি দিয়ে মন্দিরে ঢুকে পুরোহিতদের জাগাবার চেষ্টা করছিল, তাকে ধরে ফেলেছে, তাকেও নিয়ে আসছে এখানে।

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি ফোনটা!

হাতে নিয়ে বললেন, কত ছোট্ট! এগুলোর উন্নতি হচ্ছে। ভারী কাজের জিনিস। আমি কখনও ব্যবহার করিনি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, এখন কোনও লোককে বিশেষ দরকারে বাড়িতে না পেলেও যে-কোনও জায়গা থেকে খুঁজে বের করা যায়।

জোজো এতক্ষণ কিছু বলেনি, সে বলল, আমাদের বাড়িতে একটা মোবাইল ফোন আছে, সেটা দিয়ে পৃথিবীর যে-কোনও দেশের লোকেরা সঙ্গে কথা বলতে পারি, এত পাওয়ারফুল।

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, কিছুদিনের মধ্যেই চাঁদ কিংবা মঙ্গলগ্রহের সঙ্গেও কথা বলা যাবে। বাড়ির টেলিফোন উঠেই যাবে, সবারই পকেটে পকেটে থাকবে ফোন।

নরেন্দ্র বললেন, রাজা, এটা তোমার কাছেই রাখো।

কাকাবাবু বললেন, না, না, আমি নিয়ে কী করব? নরেন্দ্র বললেন, যে কদিন এখানে থাকবে, ব্যবহার করো। আমি আর-একটা জোগাড় করে নেব।

কাকাবাবু তবু আপত্তি করলেন, কিন্তু নরেন্দ্র শুনলেন না, জোর করে সেটা গুঁজে দিলেন কাকাবাবুর পকেটে। একটা কাগজে লিখে দিলেন কয়েকটা প্রয়োজনীয় নম্বর।

একটু পরেই ভূপিন্দার সিং পৌঁছে গেলেন। সঙ্গে একটা লোক, তার হাত বাঁধা। লোকটির সাধারণ চেহারা, পাজামার ওপর একটা সোয়েটার পরে, মাথার চুল কদমছাঁট, চোখদুটো দেখলে মনে হয় বেশ বুদ্ধি আছে।

আরও দুজন পুলিশ অফিসার পেছনে দাঁড়িয়ে। নরেন্দ্র তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটা কিছু স্বীকার করেছে?

তাদের একজন বললেন, না সার, কোনও কথাই বলতে চায় না। অতি ধুরন্ধর লোক।

কাকাবাবু লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, এর কোনও অপরাধ প্রমাণ হয়েছে?

নরেন্দ্র বললেন, শুনলে তো, কোনও কিছুই স্বীকার করেনি। আমি জেরা করে দেখব।

কাকাবাবু বললেন, শোনো নরেন্দ্র, অপরাধ প্রমাণ না হলে কারও হাত বেঁধে রাখা বেআইনি। মন্দিরে ঢুকে পুরুতের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা তো অপরাধ নয়। হয়তো ও কিছুই জানে না।

নরেন্দ্র বললেন, তা হতেও পারে। তবে, এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক এই একজনকেই পাওয়া গেছে।

পুলিশদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ঠিক আছে, ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও, বসিয়ে রাখো। আগে আমরা ছবিগুলো দেখে নিই।

লোকটি বসার সময় দুবার হুঁ হুঁ শব্দ করল।

ভূপিন্দার সিং ছবিগুলো বের করলেন। সবাই দেখতে লাগল একসঙ্গে।

গত বছরের মিছিলের ছবি। মোট চারখানা, তার মধ্যে তিনখানাতেই দেখা যাচ্ছে মিছিলের অনেকটা, কাঁধে করে ঠাকুরের সিংহাসন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লোকেরা, প্রত্যেকটাতে দেবতার মূর্তি, তার মধ্যে একটা ভূতেশ্বরের, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় না। একটাই শুধু ভূতেশ্বরের, তলার দিকটা ফুলে ঢাকা, হলদে রঙের মুখ, নাক, চোখ খুব পরিষ্কার নয়, তবে কপালের ওপর একটা চোখ দেখে বোঝা যায়, সেটা শিবের।

কাকাবাবু মূর্তিটা খুঁটিয়ে লক্ষ করে বললেন, মূর্তিটা ভাল। একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কতদিনের পুরনো?

ভূপিন্দার সিং বললেন, গ্রামের লোক বলে আড়াইশো, তিনশো বছর। পরীক্ষা করে তো দেখা হয়নি।

কতটা উঁচু?

প্রায় দুফুট।

তার মানে বেশ ভারী। মাথার চুলে সাপ জড়ানো। এরকম একটা মূর্তির নকল চট করে বানানো সম্ভব নয় ঠিকই। যারা চুরি করেছে, তারা যদি এটা এর মধ্যেই মাণ্ডির বাইরে পাচার করে দিয়ে থাকে, তা হলেই তো মুশকিল।

খবর পাওয়ার পর থেকে আমরা মাণ্ডি থেকে যেসব গাড়ি যাচ্ছে, আর যেসব গাড়ি আসছে, চেক করে দেখছি। তার আগেও নিয়ে যেতে পারে।

সব গাড়ি কি আর তন্নতন্ন করে দেখা হয়। সেটা সম্ভবও নয়। এটার কত দাম হতে পারে?

খুব বেশি হলে চার-পাঁচ হাজার।

চোরাকারবারিদের কাছে এটা সামান্য টাকা। তারা এজন্য নজর দেবে না। ছিটকে চোরের কাজ হতে পারে। কিন্তু ছিচকে চোররা পাপের ভয়ে দেবতার মূর্তিতে হাত ছোঁয়ায় না।

বিদেশে অনেক বেশি দাম হতে পারে।

বিদেশে যারা পুরনো জিনিস সংগ্রহ করে, তারা অনেক টাকা দেয় বটে, কিন্তু তারা বোকা নয়। পুরনো বলা হলেই তো তারা মেনে নেবে না। কার্বন টেস্ট করে বয়েস জেনে নেবে। এটা যে আড়াইশো-তিনশো বছরের পুরনো, তার কি নিশ্চয়তা আছে? গ্রামের লোকেরা একটু পুরনো হলেই অনেক বাড়িয়ে বলে।

কিন্তু কেউ তো কোনও মতলবে মূর্তিটা সরিয়েছে ঠিকই!

হয়তো একটা গণ্ডগোল পাকানোই তার উদ্দেশ্য। ওই লালপাথর গ্রামের লোকদের ওপর কারও রাগ থাকতে পারে। অনেক সময় পাশাপাশি দুটো গ্রামের লোকদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি হয়। সেরকম কখনও কিছু হয়েছে কিনা, খোঁজ নেওয়া দরকার।

লালপাথর গ্রামটা খুব দূরে আর দুর্গম জায়গায়। পুলিশ খুব কম যায়। তবু দুজনকে পাঠাচ্ছি আজ রাতেই।

এবার দেখা যাক, এই লোকটি কোন গ্রামের লোক।

কাকাবাবু লোকটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমহারা নাম কেয়া?

লোকটি শব্দ করল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ!

কাকাবাবু নরেন্দ্রকে বললেন, কী বলল বুঝলাম না। তোমরা কেউ প্রশ্ন করো।

নরেন্দ্র একজন পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিলেন।

তিনি লোকটির থুতনি ধরে উঁচু করে রুক্ষভাবে বললেন, এই তোর নাম কী রে?

লোকটি বলল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ!

তুই কোন গ্রামে থাকিস?

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ!

ঠিক করে উত্তর দে! তুই কোথা থেকে এসেছিস?

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ!

এবার মার খাবি! কথা বলছিস না যে! নাম বল!

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ!

পুলিশ অফিসারটি বিরক্ত হয়ে বলল, সার, মনে হচ্ছে লোকটা বোবা।

কাকাবাবু বললেন, বোবা কিনা তা পরীক্ষা করার একটা উপায় আছে। সন্তু, ওষুধটা দে তো।

সন্তু গিয়ে লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে খুব জোরে তার কানে ফু দিয়ে দিল।

লোকটি অমনই ছিটকে সরে গেল একদিকে। দুহাতে কান চাপা দিল।

কাকাবাবু বললেন, বোবারা কানেও শুনতে পায় না। এ যে শুনতে পায় তা বোঝাই যাচ্ছে।

জোজো বলল, আর-একটা ওষুধ আছে, দেব?

কাকাবাবু বললেন, সেটা একটু পরে।

পুলিশ অফিসারটি জোর করে লোকটির হাত সরিয়ে বললেন, এই, কথার উত্তর দে। নাম বল, না হলে কিন্তু সত্যি মারব।

লোকটি এবার মাথা নেড়ে নেড়ে শব্দ করল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ ।

কাকাবাবু বললেন, এমন হতে পারে, এর নামই হুঁ হুঁ। হুঁ হুঁ বাবু!

নরেন্দ্র বললেন, লোকটা পাগল নয় তো!

ভূপিন্দার সিং বললেন, কিংবা ইচ্ছে করে পাগল সেজেছে!

জোজো বলল, পাগল সাজা খুব সোজা। আমি ইচ্ছে করলে এমন পাগল সাজতে পারি, কেউ বুঝতে পারবে না!

নরেন্দ্র বললেন, তুমি পাগল সাজলে ধরে কার সাধ্য!

পুলিশ অফিসারটি বললেন, ওর পাগলামি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। ঠাস করে এক চড় কষালেন লোকটির গালে। লোকটি চড় খেয়েও কোনও শব্দ করল না।

কাকাবাবু বললেন, এই মারধোর কোরো না। আমি দেখতে পারি না। বরং জোজো তোমার ওষুধটা এবার লাগাও।

জোজো উঠে গিয়ে লোকটিকে কাতুকুতু দিতে লাগল। লোকটি তাতে হাসল। মুখও খুলল না। জোজো অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

কাকাবাবু বললেন, এই রে, মনে হচ্ছে লোকটি সত্যিই পাগল হতে পারে। পাগলরা সহজে হাসে না। এত কাতুকুতুতেও হাসল না!

নরেন্দ্র বললেন, যাঃ, কী যে বলো, অনেক লোকের কাতুকুতু লাগে না। আমারও তো হাসি পায় না একটুও?

ভূপিন্দার হেসে বললেন, আমার কিন্তু কেউ বগলের কাছে হাত আনলেই হাসি পেতে শুরু করে।

কাকাবাবু বললেন, নরেন্দ্র, তোমার কাতুকুতু লাগে না? বেশ, পরীক্ষা করে দেখা যাক। জোজো–

জোজো নরেন্দ্রকে কাতুকুতু দিতে শুরু করল। নরেন্দ্র মুখোনা কঠিন করে থেকে বলল, কই, দেখছ, একটুও লাগছে না।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, তুই দ্যাখ তো।

সন্তু বলল, জোজো, তুই আর আমি একসঙ্গে দুদিকে–

ওরা নরেন্দ্রর দু বগলে কাতুকুতু দিতেই নরেন্দ্র খিলখিল করে হেসে ফেলে বলতে লাগল, এই, এই, ছাড়ো, ছাড়ো।

পুলিশরা নরেন্দ্রর ওই অবস্থা দেখে হাসতে লাগল মুখ ফিরিয়ে।

কাকাবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, ছাড়িস না, আর একটু দে!

সেই লোকটিও মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করে উঠল।

৪. বাংলোর সামনে অনেকখানি বাগান

বাংলোর সামনে অনেকখানি বাগান। সেই বাগানে চেয়ার-টেবিল পেতে চা খেতে বসা হয়েছে। এখানে ঠাণ্ডা অনেক কম। দূরের পাহাড় রেখায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এক্ষুনি ডুব দেবে।

কাকাবাবু পট থেকে তৃতীয় কাপ চা ঢেলে নিলেন।

সন্তু ঘুরে ঘুরে ফুলের গাছগুলো দেখছে। জোজো আপনমনে একটা গান গাইছে গুনগুন করে।

নরেন্দ্র আর পুলিশের দলবল ফিরে গেছে একটু আগে। আবার ফিরে আসবে সন্ধের সময়।

সন্তু একটা ফুল হাতে নিয়ে টেবিলের কাছে এসে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, এটা কী ফুল বলো তো? অনেকটা গোলাপের মতন দেখতে, কিন্তু গোলাপ নয়।

কাকাবাবু বললেন, ক্যামেলিয়া। পাহাড়ি জায়গাতেই হয়। পাহাড়ি গোলাপেও গন্ধ থাকে না। গোলাপ তো আসলে শুকনো জায়গার ফুল।

সন্তু বলল, তা জানি। গোলাপ ফুল এসেছে আরব দেশ থেকে। আসল নাম তো গোলাপ নয়, জোলাপ!

জোজো গান থামিয়ে বলল, জোলাপ? অ্যাঁ, কী বাজে শুনতে লাগে!

সন্ত চেয়ারে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, তুই গান গাইছিলি রে জোজো?

জোজো বলল, কোনও গান নয়, এমনি একটা সুর।

সন্তু বলল, সেই অস্ট্রেলিয়ার নদীর গানটা আর একবার কর তো!

জোজো গেয়ে উঠল, লা হিলাহুল হামপা, গুলগুল কিরিকিরি, ডিংডাং হামপা –

সন্তু বলল, যাঃ, ঠিক হচ্ছে না। তুই নিজেই কথাগুলো ভুলে গেলি? আমার মনে আছে। এইরকম : লা হিলাহুলা হাম্পা, গুলগুল টরে টরে, ইয়াম্পু হামপা...

জোজো বলল, আমি পরের লাইনটা গাইলাম।

কাকাবাবু বললেন, বেশ সুরটা, আর-একবার গাও! সন্তু আর জোজো দুজনেই গাইল। তারপর

জোজো বলল, কাকাবাবু, এই যে লোকটা শুধু হুঁ হুঁ করছিল, সেটা শুনে আমার আর-একটা গান মনে পড়ে গেল। আফ্রিকায় ওরাকু নামে একটা ট্রাইব আছে, তারা গায়। শুনবেন?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

জোজো গাইল :

হুঁ হুঁ কিলা কিলা কিলা
হুঁ হুঁ গিলা গিলা গিলা
হুঁ হুঁ ইলা কিলা টিলা
টংগো রে, টংগো রে...

কাকাবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, বাঃ বাঃ, চমৎকার! জোজো, তুমি তো অনায়াসে আধুনিক বাংলা গানের সুরকার হয়ে যেতে পারো। অনেকরকম গানের। সুর নিয়েই তো আধুনিক গান হয়।

সন্তু বলল, তুই গানটা এইমাত্র বানালি, না রে জোজো?

জোজো বলল, বানাইনি। এইমাত্র মনে পড়ল।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা জোজো, তোমার কি মনে হয়, ওই হু হু করা লোকটা কি সত্যি পাগল?

জোজো বলল, মোটেই না। সেয়ানা পাগল!

সন্তু বলল, আমার ধারণা, লোকটা পাগলই। নইলে তো বলতেই পারত, এমনিই মন্দির দেখতে গিয়েছিল। পুরুতরা ঘুমোচ্ছে দেখে তাদের ডেকেছিল। এটা কিন্তু কিছু দোষের কাজ নয়। সাধারণ লোকেরাই তা করত। নিজের নাম, গ্রামের নামও বানিয়ে বলে দিতে পারত।

কাকাবাবু বললেন, আমরা যখন ডিটেকটিভ গল্প পড়ি, তাতে দেখা যায়, সব লোকেরই যেন কিছু না কিছু মতলব থাকে। সব লোককেই সন্দেহ করতে হয়। কিন্তু অনেক লোক তো এমনিই সাধারণ লোক হয়, অনেক পাগল সত্যিই ঘুরে বেড়ায়!

জোজো জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, আপনি কখনও খুনের মামলায় ডিটেকটিভগিরি করেছেন?

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, কোনওদিন না। সাধারণ চুরি, ডাকাতি, খুন এইসব ব্যাপার নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। ভাল বুঝিও না। এবারে দেখবি, আমি ঠিক হেরে যাব, এই মূর্তি উদ্ধার করা আমার দ্বারা হবে না।

জোজো বলল, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কাকাবাবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখো! যদি ওই পাগলটার পেট থেকে কথা বের করতে পারো।

সন্তু বলল, পাগলটা একটা উপকার করে গেছে। জোজো একটা নতুন গান বানিয়ে ফেলেছে।

সন্তু গানটা গাইবার চেষ্টা করল।

জোজো বলল, আমি একসময় আমার এক পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে ধ্যান করা শিখেছিলাম। তিনি খুব বড় তান্ত্রিক। এক মনে ধ্যান করতে করতে কোনও জিনিসের কথা ভাবলে, সেটা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ধ্যান করতে হয় রাত দুটোর সময়। আজ চেষ্টা করে দেখব।

সন্তু বলল, রাত দুটো পর্যন্ত জাগতে পারবি?

জোজো বলল, তুই ডেকে দিবি।

কাকাবাবুর কোটের পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল এই সময়।

ফোন করছেন নরেন্দ্র ভার্মা। তিনি বললেন, রাজা, যে-লোকটাকে ধরা হয়েছিল, থানায় এনে তার আঙুলে পিন ফুটিয়েও একটা কথা বের করা যায়নি। লোকটা বোধ হয় সত্যি পাগল। ওকে ছেড়ে দিতে বলেছি। এখনও পর্যন্ত আর কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি। তবে, এখানকার পুলিশ একটা খবর এনেছে। এখানকার শ্মশানে একজন সাধু থাকেন, তাঁর নাকি দূরদৃষ্টি আছে। খুব বড় যোগী। কোনও জিনিসের ছবি দেখালে তিনি বলে দিতে পারেন, সেই জিনিসটা কোথায় আছে। তাঁকে আনা হয়েছে এখানে। গাড়ি পাঠাচ্ছি। তোমরা চলে এসো।

ফোনটা অফ করে কাকাবাবু বললেন, জোজো, তোমার একজন প্রতিযোগী এসে গেছে। এখানকার একজন সাধু। তিনিও দূরের জিনিস দেখতে পান। তাঁকে দিয়ে চেষ্টা করানো হচ্ছে।

সন্তু বলল, এই রে জোজো, তোর চান্সটা ফসকে গেল!

জোজো বলল, ও পারবে না। অত সোজা নাকি? আমি আজ রাত দুটোর সময় ধ্যানে বসব। রাত্তিরে নিরামিষ খেতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, চলো সাধুর ব্যাপারটা দেখে আসা যাক।

একটু পরেই গাড়ি এসে গেল।

সাধুকে আনা হয়েছে ভূপিন্দার সিং-এর চেম্বারে। দরজা-জানলা সব বন্ধ। মেঝেতে এক বাঘছালের ওপর বসে আছেন সেই সাধুবাবা। বেশ বড়সড় চেহারা, মাথায় জটা, মুখভর্তি দাড়ি। এই শীতের মধ্যেও শুধু একটা নেংটি পরা, খালি গা। তাতে ছাই মাখা। তিনি চোখ বুজে ধ্যান করছেন।

সাধুবাবাকে ঘিরে কয়েকটি চেয়ার, তাতে নরেন্দ্র ভার্মা, ভূপিন্দার সিং ও দুজন বড় অফিসার বসে আছেন। একজন কনস্টেবল হাঁটু গেড়ে বসে আছে সাধুবাবার সামনে। কাকাবাবুরা চুপচাপ বসে পড়লেন।

তবু চেয়ার টানার সামান্য শব্দেই সাধুবাবা চোখ মেলে তাকালেন। একটা চোখ! আর-একটা চোখ একেবারে বন্ধ। বোঝা গেল, সে-চোখটা নষ্ট।

সামনের একটা ধুনিতে নারকেল ছোবড়ার আগুন জ্বলছে। কনস্টেবলটি তাতে একটু একটু ঘি দিচ্ছে আর ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর।

সন্তু জোজোকে ফিসফিস করে বলল, যাদের একটা চোখ কানা হয়, তাদের অন্য চোখটার দৃষ্টিশক্তি অনেক বেশি হয়, তাই না রে?

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট ওলটাল।

খানিক বাদে সাধুবাবা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, বোম্! বোম্! জয় বাবা ভূতেশ্বর! জয় শঙ্কর!

আবার একটা চোখ খুললেন। জ্বলজ্বল করছে সেই চোখ। মনে হয় যেন, ওই চোখ দিয়ে একসময় আগুন বেরোবে। অনেক ছবিতে যেমন দেখা যায়।

কনস্টেবলটি ভূতেশ্বর মূর্তির ছবিখানা সাধুবাবার মুখের সামনে তুলে ধরল।

সেদিকে কয়েক পলক চেয়েই সাধুবাবা ছবিটা সরিয়ে দিলেন। তারপর আবার চোখ বুজে এক আঙুল দিয়ে নিজের কপালটা ঘষতে লাগলেন খুব জোরে জোরে। আর সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে যাচ্ছেন, বোম, বোম! জয় বাবা ভূতেশ্বর!

মিনিটের পর মিনিট তিনি কপালটা ঘষতেই লাগলেন।

সন্তু কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, উনি ওরকম করছেন কেন?

কাকাবাবুর বদলে নরেন্দ্র বললেন, যোগীদের কপালের মাঝখানে একটা তিন নম্বর চোখ থাকে। সেই চোখ দিয়েই দূরের সবকিছু দেখা যায়। সেই চোখটা খোলার চেষ্টা করছেন।

একটু পরে থেমে গিয়ে সাধুবাবা কীসব যেন বলতে লাগলেন। পাহাড়ি ভাষা, ঠিক বোঝা গেল না।

কনস্টেবলটি বুঝিয়ে দিল, মরমদগাঁও আর কিষণপুর, এই দু জায়গায় মন্দির আছে, এই দুটোর মধ্যে কোনও একটাতে আছে ভূতেশ্বরের মূর্তি।

ভূপিন্দার সিং বললেন, মরমদগাঁও আর কিষণপুর নামে দুটো গ্রাম আছে ঠিকই। আর গ্রাম থাকলে মন্দির থাকবেই। কিন্তু দুটো দু দিকে।

নরেন্দ্র বললেন, দু দিকে মানে কতদূর?

ভূপিন্দার সিং বললেন, কিষণপুর পঁচিশ কিলোমিটার হবে। আর মরমদগাঁও প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার।

নরেন্দ্র বললেন, এমন কিছু দূর নয়। চলো, দুটোই দেখে আসা যাক। সাধুবাবাকে ভাল করে খাবারটাবার দাও! চলো, রাজা–

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে বললেন, দেখো নরেন্দ্র, এসব অলৌকিক ব্যাপারে আমার একটুও বিশ্বাস নেই। যা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তার পেছনে ছুটোছুটি করতে যাব কেন? তোমরা ঘুরে এসো, যদি পেয়ে যাও তো ভাল কথা, আমি ডাক বাংলোতে অপেক্ষা করব।

নরেন্দ্র বললেন, আমি যে খুব বিশ্বাস করি, তা নয়। তবে কী জানো, জলে ডোবার সময় মানুষ একটা তৃণখণ্ডও আঁকড়ে ধরে। অনেক সময় এইসব মিলেও যায়। তাই গিয়ে দেখতে চাই। পুরুত দুজনের কাছ থেকেও কিছু জানা গেল না। ওরা গাঁজা খেয়ে ঘুমোচ্ছিল। চোরকে দেখেনি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, আমরা যাব?

কাকাবাবু বললেন, যা না, ঘুরে আয়। খানিকটা বেড়ানোও তো হবে।

কাকাবাবুকে বাংলোতে নামিয়ে ওরা চলে গেল।

কাকাবাবু খানিকক্ষণ ক্রাচ বগলে নিয়ে বাগানে পায়চারি করলেন। কিন্তু এর মধ্যেই বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, বাইরে থাকা যায় না। তিনি বারান্দায় উঠে এসে বসলেন একটা ইজিচেয়ারে।

একটু পরে নৃপেন এসে বলল, সার, আপনাকে চা কিংবা কফি বানিয়ে দেব?

কাকাবাবু বললেন, এক কাপ কফি পেলে মন্দ হয় না। কালো কফি, চিনি-দুধ ছাড়া।

নৃপেন কফি নিয়ে এসে দিল কাকাবাবুকে, তারপর দাঁড়িয়েই রইল সেখানে। সে কিছু কথা বলতে চায়।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর? রাত্তিরে কী খাওয়াবে?

নৃপেন বলল, ভাল খাসির মাংস পাওয়া গেছে। কোরমা বানিয়েছি। আর ছানার ডালনা। গরম গরম আলুভাজা করে দেব।

অত কিছুর দরকার নেই।

র, ভূতেশ্বরের মূর্তিটা পাওয়া গেল?

অ্যাঁ? তার মানে?

ভূতেশ্বরের মূর্তি চুরি গেছে। সেটা উদ্ধার করার জন্যই তো আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে।

এসব কে বলো তোমাকে?

অনেকেই ভূতেশ্বর চুরির কথা জেনে গেছে।

কাকাবাবু হাসলেন। হাজার চেষ্টা করলেও এসব গোপন রাখা যায় না। হয়তো থানা থেকেই কেউ বাইরে বলে দিয়েছে। অনেক পুলিশও তো ঠাকুর-দেবতা মানে খুব।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, মূর্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। খুব। শেষ পর্যন্ত না পাওয়া গেলে বুঝি খুব গোলমাল হবে?

নৃপেন বলল, তা তো হবেই। শিবরাত্রির মেলা এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব। কত দূর দূর থেকে মানুষ আসে। প্রত্যেক গ্রামের দেবতাদের নিয়ে আসা হয়। কোনও গ্রামের দেবতা যদি মিছিলে না থাকে, তা হলে সেটা সে গ্রামের লোকদের পক্ষে দারুণ অপমানের ব্যাপার। তারা তুলকালাম বাধাবে।

এক সাধুবাবা কিছু একটা সন্ধান দিয়েছেন। সেখানে পুলিশের বড় অফিসাররা খোঁজ করতে গেছেন।

আপনি গেলেন না?

আমার খোঁড়া পা, পাহাড়ে উঠতে কষ্ট হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, পরে আবার কথা হবে।

কাকাবাবু হাত তুলে একটা ভঙ্গি করে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এখন একা থাকতে চান।

নৃপেনের বোধ হয় বাংলা কথা বলার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, সে খানিকটা নিরাশ হয়ে চলে গেল আস্তে-আস্তে।

কাকাবাবু চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

সন্তু আর জোজো ফিরে এল রাত দশটার একটু পরে।

জোজো বলল, রাবিশ! আমি জানতাম, ওই সাধুটা কিছু বলতে পারবে না!

সন্তু বলল, একেবারে মেলেনি, তা বলা যায় না। কা

কাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, খানিকটা মিলেছে?

সন্তু বলল, আমরা দুটো গ্রামেই গেলাম। দুজায়গাতেই মন্দির আছে। দুটো মন্দিরই শিবের মন্দির। একটা মন্দিরের নামও ভূতেশ্বর মন্দির। সে ভূতেশ্বরের মূর্তি অন্য একটা, বেশ ছোট। চুরি যাওয়া মূর্তিটার সঙ্গে কোনও মিল নেই।

জোজো বলল, শিবমন্দির তো অনেক থাকতেই পারে। সাধুদের কাজই তো ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখা। শুধু শুধু আমাদের ঘুরিয়ে মারল।

কাকাবাবু বললেন, খানিকটা বেড়ানো তো হল।

সন্তু বলল, মরমদগাঁও-এর রাস্তাটা খুব সুন্দর। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। একটা ঝরনাও দেখলাম।

জোজো বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে। শীতের দেশে এলে আমার বেশি বেশি খিদে পায়।

কাকাবাবু বললেন, খিদে পাওয়া তো ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এসো, তা হলে খেয়ে নেওয়া যাক।

খাওয়ার টেবিলে বসার পর পরিবেশন করতে লাগল নৃপেন। একসময় সে জোজোকে জিজ্ঞেস করল, সন্তুবাবু, মূর্তিটা পাওয়া গেল না এখনও?

জোজো আঙুল দেখিয়ে বলল, সন্তু ওর নাম। মারামারিতে চ্যাম্পিয়ান। আমার নাম জোজো, আমি বুদ্ধি খাটাই।

সন্তু অবাক হয়ে একবার নৃপেনের দিকে, একবার কাকাবাবুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, অনেকেই জেনে গেছে। না নৃপেন, এখনও হদিস করা যায়নি। তুমি এবার মাংসটা নিয়ে এসো।

নৃপেন চলে যেতেই সন্তু বলল, এই জোজো, তুই ওই কথা বললি কেন রে? আমি বুঝি সবসময় মারামারি করি?

তার কথার উত্তর না দিয়ে জোজো বলল, জানেন কাকাবাবু, কারও সঙ্গে মারামারি করতে হচ্ছে না বলে সন্তুর হাত নিশপিশ করছে!

সন্তু বলল, মোটেই না! আমার তো ইচ্ছে করছে, এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে। মানালিতে কত কী দেখার আছে, তারপর সেখান থেকে রোটাং পাস। আমরা তো হিমালয় দেখতেই এসেছি এবারে।

জোজো বলল, মূর্তিটা উদ্ধার না হলে কাকাবাবুকে এখান থেকে ছাড়বেই না। দেখি, আমি আজ রাত দুটোর সময় চেষ্টা করে। তখন ধ্যানে বসব।

সন্তু বলল, তা হলে এক্ষুনি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়।

জোজো বলল, না, একবার ঘুমোলে উঠতে পারব না। বই পড়ব। জেগেই থাকব আজকের রাতটা।

খাওয়ায় পর আর বাইরে বসা গেল না। শীত বেড়েছে, কনকনে হাওয়া দিচ্ছে।

কাকাবাবু নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। সন্তু আর জোজো পাশের ঘরে।

খাওয়া শেষ করেই ঘুমনো অভ্যেস নেই কাকাবাবুর। কিছুক্ষণ অন্তত বই পড়েন। বই পড়তে-পড়তেই ঘুম এসে যায়।

তিনি একটা ভ্রমণকাহিনী খুলে বসলেন।

বেশিক্ষণ পড়তে পারলেন না। পাশেই বিছানাটা খুব লোভনীয় মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে গরম কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়তে।

যতই শীত হোক, কাকাবাবু সব দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘুমোতে পারেন না। একটা জানলা খুলে রাখলেন। পোশাক বদলে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর সেই জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন চাঁদ। আকাশে একটুও মেঘ নেই, নীল আকাশে চাঁদটা ঝকঝক করছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় তাঁর চোখ বুজে এল।

কিছুক্ষণ পর তাঁর ঘুম ভেঙে গেল একটা শব্দ শুনে। তাঁর ঘুম খুব সতর্ক, সামান্য শব্দতেই জেগে ওঠেন। তাঁর শত্রুসংখ্যা অনেক, তাই রাত্তিরবেলা রিভলভারটা রেখে দেন বালিশের নীচে।

দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে।

কাকাবাবু শুয়ে-শুয়েই জিজ্ঞেস করলেন, কে?

কোনও উত্তর নেই। আবার সেই শব্দ।

কাকাবাবু দুবার জিজ্ঞেস করেও কোনও উত্তর পেলেন না। এত রাতে কে আসতে পারে? পুলিশের লোক হলে সাড়া দেবে না কেন?

কাকাবাবু উঠে পড়ে আলো জ্বাললেন। রিভলভারটা হাতে নিয়ে, ক্রাচ ছাড়াই লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

কেউ নেই সেখানে।

কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। এ আবার কী ব্যাপার? তিনি মোটেই ভুল শোনেননি। বেশ কয়েকবার জোরে জোরে ঠক ঠক শব্দ হয়েছে।

কেউ কি লুকিয়ে আছে?

জ্যোৎস্নার রাত। কাছাকাছি কেউ থাকলে দেখা যাবেই। বারান্দা কিংবা সামনের বাগানটা ফাঁকা। শুনশান রাত, কোনও শব্দ নেই, শুধু আকাশের চাঁদ ছাড়া আর কেউ জেগে নেই মনে হয়। স্যুদের ঘরেও আলো নেভানো।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কাকাবাবু দরজাটা বন্ধ করতে যেতেই বারান্দার এক কোণে চোখ পড়ল। চাঁদের আলোয় ওখানে কী যেন একটা চকচক করছে।

কৌতূহলী হয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। তারপর চমকে উঠলেন দারুণ ভাবে। একটা বেশ বড় মূর্তি। ভূতেশ্বরের মূর্তি? হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই, ছবিতে দেখা সেই ভূতেশ্বরের মূর্তির সঙ্গে হুবহু মিল!

কাকাবাবু রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেলেন দেওয়ালের দিকে।

কে এখানে মূর্তিটা রেখে গেল?

কেউ ফাঁদ পেতেছে? মূর্তিটার লোভ দেখিয়ে কেউ কাকাবাবুকে বাইরে টেনে এনেছে, এবার গুলিটুলি চালাবে?

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেরকম কিছুই ঘটল না। এবার তিনি নিজেই বারান্দা পেরিয়ে নেমে এলেন বাগানে।, কেউ নেই। মূর্তিটা যে বা যারাই আনুক, এর মধ্যে সরে পড়েছে।

আবার উঠে এসে কাকাবাবু বারান্দায় আলো জ্বালালেন। ভাল করে দেখলেন মূর্তিটাকে। বেশ পুরনো মূর্তি, দাঁড়িয়ে থাকা শিব, কপালে একটা চোখ, মাথার চুল যেন একটা কুণ্ডলী পাকানো সাপ।

কে এসে মূর্তিটা ফেরত দিয়ে গেল? চুরি করেছিল কেন, ফেরত দিলই বা কেন? মন্দিরে ফেরত না দিয়ে এখানে আনারই বা মানে কী? এটা কি তাঁকে উপহার?

তিনি এ পর্যন্ত চুরির কোনও সূত্র খুঁজে পাননি, কাউকে সন্দেহও করেননি। সুতরাং তাঁকে ভয় পাওয়ারও কোনও কারণ নেই। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তিনি সন্তু আর জোজোকে ডেকে তুললেন। সন্তু চট করে উঠে পড়ে, জোজোকে ধাক্কা মেরে জাগাতে হয়।

কাকাবাবু বললেন, দ্যাখ সন্তু, কী কাণ্ড!

সন্তু কাছে গিয়ে মূর্তিটা ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, এই সেই ভূতেশ্বর? এখানে কী করে এল?

কাকাবাবু বললেন, সেটাই তো রহস্য!

তারপর তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, আমার জীবনে এরকম কখনও হয়নি। আমি কোনও চেষ্টা করলাম না। কিছুই বুঝতেই পারলাম না। এমনি এমনি একটা রহস্য মিটে গেল! সন্তুকেও মারামারি করতে হল না।

জোজো বলল, বলেছিলাম কিনা, আমিই এই কেসটা সল্‌ভ করব!

সন্তু বলল, অ্যাঁ? তুই আবার কখন কী করলি?

জোজো বলল, ধ্যান করে লোকটাকে খুঁজে পেলাম। তারপর তাকে অ্যায়সা ভয় দেখালাম! তাকে বললাম, আজ রাত্তিরের মধ্যে মূর্তিটা ফেরত না দিয়ে গেলে তুই রক্ত আমাশায় মরবি! তাই তো ব্যাটা সুড়সুড় করে ফেরত দিয়ে গেল!

সন্তু বলল, তুই ধ্যান করলি কখন? তুই তো বইও পড়লি না, ঘুমিয়ে পড়লি সঙ্গে সঙ্গে। আমি কম্বল চাপা দিয়ে দিলাম তোর গায়ে।

বজোজো বলল, ওসব তুই বুঝবি না। শুয়ে শুয়েও ধ্যান করা যায়। সত্যিকারের ধ্যান আর গভীর ঘুমের মধ্যে কোনও তফাত নেই। ওই চোরটাও ঘুমোচ্ছিল। আমি ঘুমের মধ্যে সাঁতরে সাঁতরে তাকে ছুঁয়ে ফেললাম!

সন্তু বলল, তুই যে বললি, রাত দুটোর আগে তোর ধ্যানের ক্ষমতা আসে না? এখন তো মাত্র পৌনে একটা বাজে!

কাকাবাবু বললেন, শোনো জোজো, ওই ধ্যানের ব্যাপারটা লোকজনদের বোঝানো শক্ত হবে। ওটা এখন থাক। আর অকারণে মিথ্যে কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

সন্তু বলল, কিন্তু নরেন্দ্রকাকা, অন্য পুলিশরা তো জানতে চাইবে, কী করে মূর্তিটা উদ্ধার করা হল। তখন তুমি কী বলবে?

কাকাবাবু বললেন, কিছুই বলব না, শুধু মুচকি মুচকি হাসব। তোরাও তাই করবি!

৫. ঠাণ্ডার জন্য বারান্দায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না

ঠাণ্ডার জন্য বারান্দায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না। মূর্তিটাও ফেলে রাখা যায় না বাইরে। সন্তু আর জোজো ধরাধরি করে মূর্তিটা নিয়ে এল কাকাবাবুর ঘরে।

।মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, এটা রেখে দিয়ে বেশ উপকারই হচ্ছে দেখছি। নরেন্দ্র রাত্তিরে কোথায় থাকছে জানি না। কয়েকটা নম্বর দিয়ে গেছে, দেখি কোথায় তাকে পাওয়া যায়।

একটা নম্বর টিপতেই একজন লোক ধরে বলল, সেখানে নরেন্দ্র ভার্মা নেই। সে একটা অন্য নম্বর দিল। সেখানে পাওয়া গেল তাঁকে।

কাকাবাবু বললেন, কী নরেন্দ্র, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? নরেন্দ্র বললেন, না, ঘুমোইনি। কিন্তু তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ? কী ব্যাপার, কোনও অসুবিধে হয়েছে নাকি?

না, কোনও অসুবিধে হয়নি। এমনিই ঘুম আসছে না। তুমি নতুন কোনও সূত্র পেলে?

সন্তুদের কাছে তো শুনেছই, মন্দির দুটোতে কিছু পাওয়া যায়নি। এখন আমাদের মাথায় একটা অন্য চিন্তা এসেছে। সত্যিই কি মূর্তিটা এখান থেকে চুরি গেছে, না অন্য কিছু হয়েছে? হয়তো মূর্তিটা লালপাথর গ্রাম থেকেই চুরি হয়ে গিয়েছিল, পুরুতরা সেকথা আমাদের জানায়নি। কিংবা আসবার পথে কোথাও হারিয়ে ফেলেছে। কারণ, মূর্তিটা এখানে আনার পর তো আর কেউ দেখেনি!

আর কেউ দেখেনি?

না। পুরুত দুজনের কথাই এতক্ষণ বিশ্বাস করা হয়েছে। সেইজন্য লালপাথর গ্রামে গিয়ে আসল খবর নেওয়া দরকার। অতি দুর্গম জায়গা, টেলিফোন নেই, জিপগাড়িতেও শেষ পর্যন্ত পৌঁছনো যায় না, কয়েক কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়। দুজন খুব দক্ষ পুলিশ অফিসারকে আজ রাত্তিরেই সেখানে পাঠানো হচ্ছে। তারা কাল দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবে।

তারা কি রওনা হয়ে গেছে?

এই তো গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে।

তাদের যেতে বারণ করো।

বারণ করব? কেন?

ওদের যেতে হবে না। বরং তুমি চলে এসো এখানে। দেরি কোরো না।

তোমার ওখানে যাব? এত রাত্তিরে? কী ব্যাপার খুলে বলো তো?

নরেন্দ্র, তুমি তো আগে এত কথা জিজ্ঞেস করতে না! আসতে বলছি, চলে আসবে!

ঠিক আছে, আসছি!

ফোন বন্ধ করে কাকাবাবু বললেন, সন্তু, মূর্তিটা একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখ। নরেন্দ্র আসার পর বেশ একটা নাটক করতে হবে!

সন্তু বলল, আমি এখনও ভাবছি, মূর্তিটা কে ফেরত দিয়ে গেল? এখানেই বা দিল কেন? নিশ্চয়ই তোমাকে চেনে। তুমি এসেছ বলে ভয় পেয়ে গেছে!

কাকাবাবু বললেন, আমাকে এখানে কে চিনবে? পুলিশরাই চেনে না।

জোজো বলল, ওই নৃপেন হালদার চিনেছে। সে হয়তো আরও অনেককে বলে দিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, শুধু মুখের কথা শুনেই আমার মতন একজন খোঁড়া মানুষকে ভয় পাবে? চোরেরা এত ভিতু হয় না।

সন্তু বলল, চোর ধরা পড়ল না। অথচ চুরি করা জিনিস আপনি আপনি ফিরে এল, এরকম আমি আগে কখনও শুনিনি।

কাকাবাবু বললেন, চোরকে নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমরা তো এখানে আসতেই চাইনি৷ কালই মানালির দিকে চলে যাব।

নরেন্দ্র পৌঁছে গেলেন দশ মিনিটের মধ্যে।

খাটের ওপর কাকাবাবুর দুপাশে স আর জোজো বসে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। ঘরে একটিমাত্র চেয়ার।

কাকাবাবু বললেন, এসো নরেন্দ্র, বোসো ওই চেয়ারে।

নরেন্দ্র বললেন, কী ব্যাপার বলো তো? এত রাতে তোমরা সবাই জেগে বসে আছ?

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বলতে পারো, কোন জানোয়ারকে দেখলে মনে হয় গজক্ষয় কিংবা মূষিক বৃদ্ধি?

নরেন্দ্র হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, অ্যাঁ? তার মানে?

কাকাবাবু বললেন, একটা হাতি অনেক ছোট বনে গেছে, কিংবা একটা ইঁদুর খুব বড় হয়ে গেছে, এটা কোন জানোয়ারকে দেখলে মনে হয়?

এটা জিজ্ঞেস করার জন্য তুমি আমায় ডেকে এনেছ?

পারলে না? তা হলে এটা বলো, লাল রং হয় টকটকে, কালো হয় কুচকুচে, সাদা হয় ধপধপে, হলদে কী হয়?

রাজা, তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ?

আরে না, না। হঠাৎ এইসব প্রশ্ন মাথায় এলে রাত্তিরে ঘুম আসে না। আর একটা আছে। সব পাখি বাসা বাঁধে, কোকিল কেন বাসা বাঁধে না?

ধপাস করে চেয়ারটায় বসে পড়ে নরেন্দ্র বললেন, প্রথমটার উত্তর, শুয়োর। দ্বিতীয়টার উত্তর, ক্যাটকেটে। আর তৃতীয়টা, পাখিদের মধ্যে কোকিলই একমাত্র শিল্পী। আর কী আছে বলো!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, জীবনে তুমি কবার চমকে উঠেছ?

নরেন্দ্র বললেন, নরেন্দ্র ভার্মা সহজে চমকায় না। অন্তত গত দশ বছর কোনও কিছুতেই চমকাইনি। আর কোনও ধাঁধাটাঁধা দিয়ে আমাকে চমকে দেবে?

কাকাবাবু বললেন, তোমার কান থেকে যদি একটা মুরগির ডিম বের করি, তুমি চমকাবে না?

নরেন্দ্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, ম্যাজিশিয়ানরা এরকম অনেক খেলা দেখায়, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?

কাকাবাবু খাট থেকে নামলেন।

দরজার পাশে রাখা মূর্তিটার ওপর থেকে একটানে কম্বলটা সরিয়ে ফেলে বললেন, দ্যাখো তো, এটা কীরকম ম্যাজিক?

নরেন্দ্রর চোখ দুটো রসগোল্লার মতন গোল হয়ে গেল। লাফিয়ে উঠে বললেন, এটা কী?

তারপর মূর্তিটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সেটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, হ্যাঁ, এই তো ভূতেশ্বরের মূর্তি। একেবারে অরিজিনাল। ম্যাজিক তো নয়। রাজা এটা তুমি কোথায় পেলে?

কাকাবাবু বললেন, তবে নাকি নরেন্দ্র ভার্মা কখনও চমকায় না?

নরেন্দ্র অভিভূত ভাবে বললেন, তুমি একটা জিনিয়াস!

কাকাবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, ভেবেছিলে আমাকে জব্দ করবে। জোর করে ধরে নিয়ে এসে এমন একটা কঠিন কেস দেবে, যেটার আমি কিছুই করতে পারব না। সবাইকে বলবে, দেখেছ, দেখেছ, রাজা রায়চৌধুরী সামান্য একটা চোরের কাছেও হেরে যায়।

নরেন্দ্র বললেন, যাঃ, কী যে বলো! তবে সত্যি কথা বলছি, এবারে মনে হয়েছিল, আমরা কেউই পারব না। সময় যে কম। দুদিনের মধ্যে উদ্ধার করতে

পারলে... যাক, ধড়ে প্রাণ এল! দারুণ একটা বিপদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কত কী হতে পারত! উফ! এবার বলো তো, কী করে তুমি এমন অসাধ্যসাধন করলে? আমরা যখন মন্দির দুটো দেখতে গিয়েছিলাম, তখন তুমি বুঝি একা একা অন্য জায়গায় খোজ করেছ?

উত্তর না দিয়ে কাকাবাবু শুধু মুচকি হাসলেন।

নরেন্দ্র সন্তু আর জোজোর দিকে তাকালেন। তাদের দুজনেরই ঠোঁটে হাসি আঁকা।

জোজো হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। সন্তু তাকে একটা খোঁচা মেরে বলল, এই, জোরে জোরে তো হাসার কথা নয়!

নরেন্দ্র বললেন, তোমরা আমাকে বোকা বানাচ্ছ? মূর্তিটা কোথা থেকে পাওয়া গেল, সেটা আমার জানা দরকার।

কাকাবাবু বললেন, জিনিসটা পাওয়া নিয়ে কথা। পেয়ে গেছ, ব্যস! তবে, তোমাদের যদি কোনও পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপার থাকে, তা হলে সন্তু আর জোজোকে দিয়ো। ওদের দুজনকেই মূর্তিটা ধরাধরি করে ঘরে আনতে আমি দেখেছি।

নরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, সন্তু এটা কোথায় পেলে তুমি?

সন্তু বলল, আমি তো জানি না। জোজো জানে।

জোজো বলল, ভ্যাট! আমি তো তখন ঘুমোচ্ছিলাম। তুই-ই তো আগে দেখলি।

নরেন্দ্র একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, মূর্তিটা তা হলে নিয়ে যাই? কত লোক দুশ্চিন্তা করছে, আমার অফিসাররা সবাই এখনও জেগে আছে।

ভারী মূর্তিটা গাড়িতে তোলার জন্য সন্তু আর জোজো সাহায্য করল নরেন্দ্রকে। গাড়ির দরজা বন্ধ করার আগে নরেন্দ্র বললেন, মূর্তিটা পেয়ে এত খুশি হয়েছি যে, তোমাদের দুষ্টুমির ঠিক উত্তর দিতে পারলাম না। পরে একদিন মজা দেখাব। রাজাকে সুষ্ঠু!

ঘরে ফিরে এসে ওরা দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ল। নরেন্দ্র খুবই বুদ্ধিমান মানুষ, তাঁকে হতভম্ব করে দেওয়া সোজা কথা নয়। কাকাবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, অনেকদিন পর বেশ খাঁটি আনন্দ পাওয়া গেল। চোরদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

পরের দিন সকালে মানালিতে যাওয়া হল না। নরেন্দ্র কিছুতেই যেতে দিলেন না। শিবরাত্রির উৎসব দেখে যেতেই হবে। তার আগে কোনও গাড়িও পাওয়া যাবে না।

মিছিল দেখার জন্য অনেক আগে থেকে জায়গা নিতে হয়। শহর একেবারে ভিড়ে ভিড়াক্কার। সব লোক চলেছে মেলার মাঠের দিকে। দূর দূর গ্রাম থেকেও আসছে হাজার হাজার মানুষ। এত ভিড়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আর গাড়িতে যাওয়া যায় না। পুলিশ এক জায়গায় সব গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছে, বাকিটা পথ হেঁটে যেতে হবে।

ক্রাচ বগলে নিয়ে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে কাকাবাবুর। লোকে ঠেলছে। অনবরত। তার অবস্থা দেখে একজন পুলিশ এগিয়ে এল সাহায্য করতে। এখন সব পুলিশই কাকাবাবুকে চিনে গেছে।

তবু তিনি উলটো দিকের একজন লোককে দেখে থমকে গেলেন। এই লোকটাকেই তিনি সেতুর কাছে গাড়ি চালাতে দেখেছিলেন। মাথায় মস্ত বড় সাদা পাগড়ি, মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ, হাঁটু পর্যন্ত ঢোলা জামা পরা।

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটিকে চিনতে পারছিস?

সন্তু বলল, কাল না পরশু গাড়িতে দেখলাম।

কাকাবাবু বললেন, আগে কখনও দেখিসনি?

সন্তু বলল, মনে তো পড়ছে না।

কাকাবাবু বললেন, আমি কোনও মানুষের মুখ একবার দেখলে কিছুতেই ভুলি। তবে কবে দেখেছি, কোথায় দেখেছি, তা সবসময় মনে পড়ে না। সেটা মনে না পড়লে মনটা খচখচ করে। হ্যাঁ, এই মুখ আমি কোথাও দেখেছি ঠিকই।

সামনের দিকে কীসের জন্য যেন জ্যাম হয়ে গেছে। কেউ এগোতে পারছে না। পাগড়িওয়ালা লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়েছে কাছেই। সে কিন্তু মেলার মাঠের দিকে যাচ্ছে না, যাচ্ছে উলটো দিকে।

কাকাবাবু পাগড়িওয়ালার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তারপর লোকটার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই কাকাবাবু নিচু গলায় বললেন, বঁ ঝুর!

লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে বলল, বঁ ঝুর!

কাকাবাবু ইচ্ছে করে পা হড়কে যাওয়ার ভঙ্গি করে লোকটির গায়ে ঢলে পড়লেন। মুখে বললেন, পারদো, পারদো! পারদোনে মোয়া।

লোকটি কাকাবাবুকে সোজা হয়ে দাড়াতে সাহায্য করতে করতে বলল, দা কর! দা কর!

তারপরেই তার চোখে ফুটে উঠল দারুণ বিস্ময়। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়েই ফিরিয়ে নিল মুখ। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জোরে অন্য লোকদের ঠেলেঠুলে অন্যদিকে চলে গেল।

কাকাবাবু আপন মনে বললেন, হু, শুধু চোখ দেখেও মানুষকে চেনা যায়।

সন্তু আর জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা ওই লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারবি? শুধু দেখবি, মেলার উলটো দিকে কোথায় যাচ্ছে, পনেরো মিনিট সময়। না পেলে চলে আসবি। দুজনে দুদিকে যা। সন্তু আর জোজো ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

পুলিশটি কাকাবাবুকে একটা উঁচু জায়গায় বসিয়ে দিল। এখানে বিশিষ্ট লোকদের জন্য কয়েকটা চেয়ার রাখা আছে। সামনে রেলিং। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে মিছিলের বাজনা।

এই দিনটাতে সমস্ত সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, আগেকার রাজা ও জমিদারদের বংশধররাও আসেন দেবতাদের শোভাযাত্রা দেখতে। ধনী পরিবারের মহিলাদেরও আসতে হয় খানিকটা পায়ে হেঁটে। মেলার মাঠ লোকে গিসগিস করছে। কাকাবাবুদের জায়গাটা উঁচু বলে দেখতে অসুবিধে নেই, শোভাযাত্রা এইদিক দিয়ে ঘুরে মেলার মাঠে পৌঁছবে।

সন্তু আর জোজো ফিরে আসতে না আসতেই মিছিল শুরু হয়ে গেল।

জোজো বলল, আমি লোকটাকে দেখতে পেয়েছি। একটা দোকানে ঢুকল চা খেতে।

সন্তু বলল, আমি যে দেখলাম লোকটা ভিড়ের বাইরে গিয়েই একটা গাড়িতে উঠে সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিল।

জোজো বলল, তুই ভুল দেখেছিস। অন্য লোককে দেখেছিস।

সন্তু বলল, তুই যে ঠিক দেখেছিস, তার প্রমাণ কী।

জোজো বলল, লোকটা বোধ হয় এখনও সেই দোকানে বসে আছে। চল, দেখিয়ে দিচ্ছি।

কাকাবাবু বললেন, মিছিল শুরু হয়ে গেছে, এখন আর যাওয়া অসম্ভব। যাক, দরকার নেই। এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট নয়।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, তুমি কি মনে করতে পেরেছ, লোকটাকে কোথায় দেখেছ?

কাকাবাবু বললেন, বোধ হয় পেরেছি। তবে এখনও একশো ভাগ নিশ্চিত নই।

জোজো জিজ্ঞেস করল, আপনি কি লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন? কী যেন ভাষা বললেন?

কাকাবাবু বললেন, ওসব কথা পরে হবে। আমরা কথা বললে অন্য লোকের অসুবিধে হচ্ছে। এখন দেখো সামনের দিকে।

মিছিলের আগে আগে আসছে বাজনদারদের দল। কতরকমের বাজনা! কাড়াকাড়া, শিঙা, ভেঁপু, ঢাক-ঢোল। এক একটা পেতলের ভেঁপু কী বিরাট, একজন তা কাঁধে করে বয়ে যাচ্ছে, আর একজন বাজাচ্ছে। মানুষজনের পোশাকেরও কত রং! চতুর্দিক ঝলমল করছে একেবারে।

পুরুতদের কাঁধে চড়ে আসছেন এক-একটা গ্রামের দেবতা। পালকি কিংবা সিংহাসনে। অনেকটাই ফুলে ফুলে ঢাকা। এক একটা পালকি আবার সাজানো হয়েছে হাঁসের মতন কিংবা নৌকোর মতন। অনেক জ্যান্ত মানুষও দেবতা সেজেছে। বাঘছাল পরা, খালি গায়ে ছাই মাখা, হাতে ত্রিশূল, মাথায় সত্যি সত্যি। একটা সাপ জড়ানো। সেই জ্যান্ত শিব একটা ঠেলাগাড়িতে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে আশীর্বাদ করছেন।

সন্তু বলল, এই শীতের মধ্যে খালি গায়ে আছে কী করে?

জোজো বলল, একরকম গাছের শিকড় আছে, সেটা চিবুলে গা গরম হয়ে যায়। হিমালয়ে পাওয়া যায় কিংকারু গাছ, তার শিকড় একবার এক সাধু আমার বাবাকে দিয়েছিল। তার একটুখানি চিবিয়েছি, অমনি মনে হল, আমার গায়ে একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর! জামা, গেঞ্জি সব খুলে ফেলতে হল।

সন্তু বলল, বিশল্যকরণীর নাম শুনেছি। কিংকারু গাছের নাম শুনিনি কখনও।

জোজো বলল, ওটা খুব গোপন। খুব কম লোকই জানে। তোকে বলে ফেললাম!

কাকাবাবু বললেন, আমাদের ভূতেশ্বর কখন আসবে? তোরা কি বুঝতে পারছিস, এই ভিড়ের মধ্যে অনেক সাদা পোশাকের পুলিশ ছড়িয়ে আছে?

জোজো বলল, সাদা পোশাকে থাকলে বুঝব কী করে?

কাকাবাবু বললেন, ধর্মীয় উৎসবে বেশি পুলিশ থাকলে ভাল দেখায় না। তবু যাতে কোনওরকম গণ্ডগোল না হয়, তাই পুলিশরা অন্য পোশাকে দর্শক সেজে থাকে। পুলিশদের মুখের মধ্যে কিছু একটা ছাপ থাকে, যে-জন্য আমি তাদের দেখলেই চিনতে পারি। ওই যে দেখ না, কোণের রেলিংয়ের ধারে যে লোকটা পঁড়িয়ে আছে, দেখলে মনে হবে, সাদাসিধে গ্রামের লোক। ওর লম্বা জামাটা কোমরের কাছে এক জায়গায় ফুলে আছে লক্ষ করেছিস? ওখানে গোঁজা আছে রিভলভার!

জোজো জিজ্ঞেস করল, এই মিছিল কখন শেষ হবে?

কাকাবাবু বললেন, আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা। তার মধ্যে তো মাত্র কয়েকশো এসেছে শুনেছি। দু-তিন ঘণ্টা তো লাগবেই।

জোজো বলল, একটু একটু খিদে পেয়ে যাচ্ছে।

সন্তু বলল, এই ভিড় ঠেলে এখন কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। চুপ করে বসে থাক।

শোভাযাত্রা চলছে তো চলছেই। কোনওটা ছোট দেবতা, কোনওটা বড় দেবতা। এক এক সময় বাজনা বেড়ে যাচ্ছে। নাচছে একদল মানুষ। বহু লোক ছবি তুলছে নানারকম ক্যামেরায়। তাদের মধ্যে সাহেবও আছেন।

যদিও সবই খুব সুন্দর, তবু দেখতে দেখতে এক সময় একঘেয়ে লাগে। ঘণ্টা দু-এক কেটে গেছে, হঠাৎ সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, ওই তো আমাদের ভূতেশ্বর!

একটা বেশ সিংহাসনে বসানো হয়েছে সেই ভূতেশ্বর মূর্তি। অন্যান্য মূর্তির চেয়ে এই মূর্তিটা আলাদা ভাবে চেনা যায়। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন মানুষ সিংহাসনের সামনে আর পেছনে ধেই ধেই নাচছে। বাজনাও বাজছে খুব।

কাকাবাবু হেসে বললেন, এই ভূতেশ্বর মূর্তিটা আমাদের হয়ে গেল, তাই না? আমরাও লালপাথর গ্রামের মানুষ!

সন্তু বলল, এই মিছিলে এই ভূতেশ্বর মূর্তি না থাকলে সত্যিই মানুষজন খেপে যেত। চোরটাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

জোজো বলল, আমাদের কোনও পুরস্কার দেবে নাকি রে?

সন্তু বলল, যদি দেয়, তুই কী চাইবি?

জোজো বলল, আমরা এখানে যতবার ইচ্ছে আসব। আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, এটা একটা ভাল ইচ্ছে। বললেই ওরা আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে যাবে মনে হয়।

জোজো বলল, আমাদের ভূতেশ্বর তো দেখা হয়ে গেল। এবার আমরা যেতে পারি না?

সন্তু বলল, দাঁড়া, ভিড়টা একটু কমুক। কিছু কিছু লোক এর মধ্যেই মেলার মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। ওখানে অনেকরকম নাচ-গান হবে।

মিনিট দশেক পরে হঠাৎ পর পর দুবার প্রচণ্ড আওয়াজ হল। খুব জোরে বাজ পড়ার মতন। কিন্তু আকাশে একটুও মেঘ নেই। যুদ্ধের সময় প্লেন থেকে যখন বোমা পড়ে, তখনও এই রকম শব্দ হয়।

কোথা থেকে শব্দটা এল, ঠিক বোঝা গেল না। মিছিলে কেউ বোমা ফেলেছে? মিছিলটা থেমে গেছে, সবাই ভয়-পাওয়া মুখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

একটু পরেই আবার একটা ওই রকম প্রচণ্ড শব্দ। এবার বোঝা গেল, মিছিলে নয়, শব্দটা আসছে খানিকটা দূর থেকে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, কীসের শব্দ?

কাকাবাবু বললেন, এখান থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। লোকজন দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছে, এর মধ্যে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এখানেই বসে থাকো।

খানিকবাদে একজন পুলিশ অফিসার এসে কাকাবাবুদের ডেকে নিয়ে গেল।

একটা পুরনো বাড়ি, তার বাইরে লেখা আছে, সেটা রাজবাড়ি। সেই বাড়ির একটা হল ঘরে নরেন্দ্র আর চার-পাঁচজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। সকলেরই উৎকট গম্ভীর মুখ।

কাকাবাবুকে দেখেই নরেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, রাজা, একটা সাজ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বোমাগুলো কোথায় ফাটল? নরেন্দ্র বললেন, বোমা নয়, ডিনামাইট। জেলখানায়। অত্যন্ত শক্তিশালী। উৎসবের জন্য অনেকেই আজ এখানে এসেছে, জেলখানাতে কয়েকজন মাত্র প্রহরী। সেই সুযোগে কারা এই ডিনামাইট

ফাটিয়েছে, জেলের এক দিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। অন্তত বাইশ জন কয়েদি পালিয়েছে, তার মধ্যে চোদ্দোজনই বিদেশি!

কাকাবাবু বললেন, মাণ্ডি একটা ছোট জায়গা। এখানকার জেলে এত বিদেশি ছিল কেন?

নরেন্দ্র বললেন, এখানে খুব ড্রাগ স্মাগলিং হয়। সেই চোরাকারবারীদের মধ্যে কিছু দেশি লোক থাকে, বিদেশিও থাকে। মাঝে মাঝে ধরাও পড়ে। এক বছর আগে বিদেশি চোরাকারবারীদের একটা বড় গ্যাং ধরা পড়েছিল। তাদের কারুর পাঁচ বছর, কারও সাত বছর কারাদণ্ড হয়েছে, সেই দলটাই পালিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, সময়টা ওরা ঠিক বেছে নিয়েছিল। ওদিকে কারওর নজর ছিল না।

নরেন্দ্র বললেন, চলো রাজা, তুমি একবার জেলখানাটা দেখে আসবে!

কাকাবাবু বললেন, আমি দেখে কী করব?

নরেন্দ্র বললেন, জায়গাটা একবার নিজের চোখে দেখলে তুমি হয়তো কিছু বুঝতে পারবে।

কাকাবাবু হাত জোর করে বললেন, মাফ করো, নরেন্দ্র, এর মধ্যে আমি আর নিজেকে জড়াতে চাই না। এখন তোমাদের কাজ ওই পলাতক কয়েদিদের খুঁজে বার করা, তাতে আমি আর কী সাহায্য করতে পারি?

নরেন্দ্র বললেন, এখানে এত পাহাড়, এত লুকোবার জায়গা, খুঁজে বার করা কি সোজা কথা।

ভূপিন্দর সিং বললেন, আপনি এত সহজে মূর্তিটা উদ্ধার করে দিয়ে আমাদের বাঁচিয়েছেন। আপনি জাদু জানেন। আপনি নিশ্চয়ই একটা উপায় বাতলে দিতে পারবেন।

কাকাবাবু তাঁর দিকে ফিরে বললেন, মাপ করুন সিংজি। আমি জাদু জানি না। একটা পেরেছি বলেই যে এটা পারব, তার কোনও মানে নেই। কয়েদিদের খোঁজাখুঁজি করার জন্য পাহাড়ে ছোটাছুটি করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? আমরা বেড়াতে এসেছি, একটু নিশ্চিন্তে বেড়াতে দেবেন না?

এর পরে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সবাই কাকাবাবুকে ঝুলোঝুলি করতে লাগল।

কাকাবাবু জেদ ধরে রইলেন। তিনি আর কিছুতেই এখানে থাকতে রাজি নন। আজই মানালি চলে যেতে চান।

৬. গাড়িটা ছাড়ল সন্ধে সাড়ে ছটায়

গাড়িটা ছাড়ল সন্ধে সাড়ে ছটায়। এখান থেকে মানালি পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লাগার কথা। রাস্তা ভাল, রাত্তির বেলাতেও গাড়ি চালাতে কোনও অসুবিধে নেই।

কাকাবাবুদের সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর একটা বড় ফ্লাস্ক ভর্তি চা। টেলিফোনে মানালিতে একটা হোটেলও বুক করা হয়ে গেছে।

শহর ছাড়াবার পর সন্তু বলল, মূর্তি-চোরটার পরিচয় আর জানা হল না। ওটা রহস্যই রয়ে গেল!

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, কোনও পুরস্কারও দিল না!

কাকাবাবু বললেন, জেলখানার ব্যাপারটায় সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল! মূর্তির ব্যাপারটা আর ওদের মনে নেই। তবু যা হোক গাড়িটার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

।সন্তু বলল, ডিনামাইট দিয়ে জেলখানার পাঁচিল উড়িয়ে দিয়েছে। একবার সেটা দেখতে ইচ্ছে করছিল।

কাকাবাবু বললেন, না, না, একবার একটু আগ্রহ দেখালেই ওরা আমাদের জড়িয়ে ফেলত। শুধু শুধু বসে থাকতে হত মাণ্ডিতে।

তারপর হেসে বললেন, কোনও চেষ্টা না করেই আমরা মূর্তিটা উদ্ধার করে দিয়েছি। সে ভাবে তো আর কয়েদিদের ধরা যেত না। তাই এখান থেকে এখন

সরে পড়াই ভাল!

জোজো বলল, কাকাবাবু, আজ সকাল থেকে নৃপেন হালদারকে দেখতে পাইনি। অন্য একজন খাবার দিল।

কাকাবাবু বললেন, সেই লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। সে বলল, আজ নৃপেনের অফ ডে। সে নিজের বাড়িতে চলে গেছে।

জোজো বলল, আমার মনে হয়, নৃপেন ওই মূর্তিটা ফেরত আনার ব্যাপারে কিছু জানে।

কাকাবাবু বললেন, জানতেও পারে, না জানতেও পারে। তাই ওকে বেনিফিট অফ ডাউট দেওয়া গেল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, বেনিফিট অব ডাউটের বাংলা কী হবে?

জোজো বলল, ডাউট মানে তো সন্দেহ?

কাকাবাবু বললেন, এসব তো ইংরেজদের তৈরি করা আইনের কথা। ঠিক বাংলা হয়নি। কিন্তু চেষ্টা করা যেতে পারে। না, জোজো ডাউট মানে সন্দেহ নয়। ডাউট মানে সংশয়। অর্থাৎ ঠিক না ভুল বুঝতে পারা না গেলে, তখনই সংশয় হয়, সুতরাং বেনিফিট অব ডাউট-কে সংশয়ের অবকাশ বলা যেতে পারে।

সন্তু বলল, অনেকটা রাস্তা, সময় কাটাতে হবে তো! একটা কিছু করা দরকার। বল তো জোজো, টুইংকল টুইংকল লিট্‌ল স্টার, এই লাইনটার বাংলা কী হবে?

জোজো বলল, টুইংকল মানে ঝিকমিক, তাই না? এর বাংলা বেশ সোজা, ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি ছোট্ট তারা!

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, চমৎকার হয়েছে। সন্তু, তুই পরের লাইনটা বল!

সন্তু বলল, হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর..কী যে তুমি, ভেবে আমি আত্মহারা...

বলতে বলতে সন্তু হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলল, কাকাবাবু, সামনের গাড়িটা আমি চিনতে পেরেছি

কাকাবাবু বললেন, চিনতে পেরেছিস মানে? কোন গাড়ি?

সন্তু বলল,সেই যে মাথায় পাগড়িওয়ালা লোকটাকে তুমি খুঁজতে বলেছিলে? সে ভিড় ঠেলে একটা গাড়িতে উঠে গেল। এইটা সেই গাড়ি। নম্বরটা আমার মনে আছে।

কাকাবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, তাই নাকি? গাড়িটা কে চালাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না।

সন্তু বলল, অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গাড়িতে দুজন লোক আছে।

জোজো বলল, এটা অন্তত বোঝা যাচ্ছে, কারও মাথায় পাগড়ি নেই।

সন্তু বলল, পাগড়ি খুলে রাখতে পারে।

কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, ওই গাড়িটার পেছন পেছন চলল। হারাতে দিয়ো না।

এই পাহাড়ি রাস্তায় সামনের গাড়িকে ওভারটেক করে যাওয়া মুশকিল। তাই এই গাড়ির লোকদের দেখার উপায় নেই। দুটো গাড়ি সমানভাবে চলল।

খানিক বাদে দেখা গেল, সামনের অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। কোনও কারণে ট্র্যাফিক জ্যাম। কাকাবাবুদের গাড়িও থামাতে হল।

সে গাড়ি থামতেই সন্তু নেমে গেল ঝট করে। দৌড়ে গেল সামনের দিকে। খানিক বাদে ফিরে এসে বলল, হ্যাঁ কাকাবাবু, সেই লোকটাই। পাগড়ি খুলে রেখেছে। সঙ্গে অন্য একটা লোক।

কাকাবাবু বললেন, গাড়িগুলো এখানে আটকে গেল কেন?

সন্তু বলল, পুলিশ সব গাড়ি চেক করছে।

কাকাবাবু বললেন, জেল-ভাঙা কয়েদিরা আছে কি না দেখছে। কিন্তু তারা কি আর এইভাবে প্রকাশ্যে পালাবে?

সব গাড়িই একে একে ছাড়া পেয়ে গেল। কাকাবাবুদের গাড়িটা নীল রঙের গাড়িটার পিছু ছাড়ল না।

আরও দশ-বারো কিলোমিটার যাওয়ার পর আগের গাড়িটা হঠাৎ ডান দিকে বেঁকল। সেটা একটা সরু রাস্তা, একটাই গাড়ি যেতে পারে, উঠে গেছে। ওপরদিকে।

এ-গাড়ির ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, এবার কী করব সার? এদের ফলো করব?

কাকাবাবু চিন্তিত ভাবে বললেন, না, গাড়িটা থামিয়ে রাখো। তারপর থুতনিতে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

সন্তু আর জোজো কিছুই বুঝতে পারছে না। সন্তু সাধারণত এই সময় কাকাবাবুকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। সে জানে, কিছু বলার থাকলে কাকাবাবু নিজেই বলবেন।

কিন্তু জোজোর অত ধৈর্য নেই। সে বলল, কাকাবাবু, লোকটা কে?

কাকাবাবু বললেন, একেবারে নিশ্চিত না হয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। মনে হচ্ছে যেন চিনতে পেরেছি। লোকটিকে ফলো করার কোনও কারণ নেই। শুধু আমার একটা কৌতূহল হচ্ছে, একজন মানুষ কেন অন্যরকম সেজে থাকে?

জোজো বলল, চলুন, ওপরে গিয়ে ভাল করে লোকটাকে দেখি!

কাকাবাবু বললেন, এই সরু রাস্তায় আমাদের গাড়ি উঠলেই তো লোকটা টের পেয়ে যাবে। থাক, দরকার নেই। শুধু একটা কৌতূহল মেটাবার জন্য অনেক সময় নষ্ট হবে। চলো, আমরা মানালিতেই যাই।

জোজো বলল, আপনার কৌতূহল হলে সেটা মিটিয়ে নেওয়াই তো উচিত।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, এই রাস্তাটার ওপরে একটা গেট আছে। তাতে কী যেন লেখা আছে দেখছি!

অন্ধকারে পড়া যাচ্ছে না। সন্তু নেমে গিয়ে দেখে এসে বলল, হিল ভিউ লজ। ওপরে একটা হোটেল আছে।

কাকাবাবু এবার খানিকটা উৎসাহিত হয়ে বললেন, হোটেল? তা হলে তো যে-কেউ যেতে পারে। এক কাজ করলে হয়, এখন মানালি না গিয়ে আজ রাতটা আমরা এই হোটেলেই থেকে যেতে পারি। বেশ ফাঁকা জায়গা, ভালই লাগবে মনে হয়।

সন্তু বলল, ওই লোকটাও বোধ হয় হোটেলটাতেই গেল। আমার এখানেই থাকতে ইচ্ছে করছে।

গাড়িটা সরু রাস্তাটায় ঢুকে উঠতে লাগল ওপরদিকে। বেশ খাড়া রাস্তা। একটু ভুল হলেই গাড়ি নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। বেশ উঁচুতে হোটেলটার সামনেই রাস্তাটা শেষ। আর কোনও বাড়ি নেই।

সেই নীল গাড়িটা এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা ঘরে আলো জ্বলছে, হোটেলে বেশ লোকজন আছে মনে হচ্ছে। এত উঁচুতে হোটেল, সেখানেও মানুষ আসে।

গাড়ি থেকে নামার পর ড্রাইভার বলল, আমাকে ছেড়ে দেবেন, সার? কাল সকালে আমার ডিউটি আছে, দিল্লি যেতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, চলে যাও। হোটেল থেকে নিশ্চয়ই অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে!

হোটেলের অফিসঘরের কাউন্টারে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা তিনজন। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকল, সন্তু!

সন্তু চমকে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখল, একটি কিশোরী মেয়ে নামছে, লাল রঙের ওভারকোট পরা।

কাকাবাবুও ঘুরে তাকিয়ে বললেন, আরে, এ তো দেবলীনা!

দেবলীনা তরতর করে নেমে এসে বলল, ও মা, কী মজার ব্যাপার! এখানে দেখা হয়ে গেল। তোমরা আজ এলে কেন? আগে আসতে পারোনি?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তোরা এখানে কবে এসেছিস?

দেবলীনা বলল, তিনদিন আগে। কোনও মানে হয়, এই তিন দিন একা একা রইলাম!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, একা একা মানে? তোর বাবা আসেননি?

দেবলীনা বলল, হ্যাঁ এসেছে। তোদের সঙ্গে দেখা হলে কত মজা হত। আমরা গুহা দেখতে গিয়েছিলাম কাল, এখানে একটা দারুণ গুহা আছে। ঠিক আছে, আমি যাব না।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবি না?

দেবলীনা বলল, আমাদের তো একটু পরেই চেক আউট করার কথা। চলে যাচ্ছিলাম।

একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন দেবলীনার বাবা শৈবাল দত্ত।

তিনিও খুব অবাক হয়ে বললেন, আরে, কাকাবাবু, সন্তু! ইটস আ স্মল ওয়ার্ল্ড! এরকম একটা নামহীন জায়গাতেও চেনাশুনো কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ভাবা যায়?

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এ রকম নামহীন জায়গার হোটেলে তোমরা এলে কেন?

শৈবাল বললেন, জানেনই তো, আমার মেয়ে কেমন পাগল। পাহাড় ওকে টানে। প্রত্যেক বছর ওকে একবার অন্তত পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবেই। বেশিরভাগ ছিল স্টেশনেই

খুব ভিড় হয়। আমি আবার ভিড়ভাট্টা একেবারে পছন্দ করি না। তাই বেছে বেছে নির্জন জায়গার হোটেল খুঁজি।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এ হোটেলটা ভাল?

শৈবাল বললেন, খুবই ভাল। অনেক পাহাড় দেখা যায়, একটা জলপ্রপাতও আছে। খাবারদাবারও ভাল। হোটেলের মালিকের ব্যবহারও বেশ ভদ্র, ওই তো মালিক, আলাপ করে দেখবেন।

পাশেই ডাইনিং রুম। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি লোক এ দিকেই চেয়ে আছে। এ সেই লোকটি, এখন মাথায় আবার সাদা পাগড়ি।

দেবলীনা কাকাবাবুর পিঠে একটা কিল মেরে বলল, তোমরা খুব খারাপ! হিমাচলে আসবে, আমাকে বলেনি কেন?

কাকাবাবু বললেন, আমাদের তো আগে থেকে ঠিক থাকে না। যাই হোক, দেখা তো হল!

দেবলীনা বাবার দিকে ফিরে বলল, তোমার দরকার থাকে তুমি চলে যাও, আমি এখানে আরও থাকব।

শৈবাল বললেন, তা কি হয়! প্লেনের টিকিট কাটা আছে।

কাকাবাবু বললেন, তোমাদের আজ এই রাত্তিরে চলে যেতে হবে কেন? কোথায় প্লেন? দিল্লিতে?

শৈবাল বললেন, না। কুলুর কাছে একটা ছোট এয়ারপোর্ট আছে। সেখান থেকে দিল্লিতে প্লেন যায়। কাল দিল্লিতে আমার খুব জরুরি কাজ আছে। মুশকিল কী জানেন, প্লেনটা ছাড়ে ভোর সাড়ে পাঁচটায়। এই হোটেলে থেকে অত ভোরে গিয়ে প্লেন ধরা খুব শক্ত। তাই এয়ারপোর্টের কাছে একটা হোটেলে রাত কাটাতে হবে।

দেবলীনা বলল, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি না।

শৈবাল বলল, এই রে, আবার পাগলামি শুরু হল। কাকাবাবু, আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

কাকাবাবু বললেন, দেবলীনা আমাদের সঙ্গে কয়েকটা দিন থেকে গেলে খুব অসুবিধে হবে? কয়েকদিন পর আমরাও দিল্লি ফিরব। ও আমাদের সঙ্গেই ফিরবে।

শৈবাল বললেন, ওকে রেখে যাওয়া যেত। কিন্তু আজ সকালেই টেলিফোন পেয়েছি, দিল্লিতে ওর মাসি থাকেন, হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাঁচবেন কি না সন্দেহ। তিনি ওকে খুবই ভালবাসেন। ওকে দেখতে চান। আমার তো কাজ আছেই, তা ছাড়াও প্লেনের টিকিট কিনেছি এই জন্যই।

মেয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে খুকি, তুই তোর মাসিকে শেষ দেখা দেখতে চাস না?

দেবলীনা উত্তর না দিয়ে মুখ গোঁজ করে রইল।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে তো আর আটকানো যায় না। ঠিক আছে, এর পরেরবার আমরা একসঙ্গে কোনও পাহাড়ে যাব।

শৈবাল বললেন, আপনাদের রাত্তিরের খাওয়া হয়নি তো? চলুন, একসঙ্গে খেয়ে নিই। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়ব।

কাকাবাবুদের জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল ওপরের দুটি ঘরে।

সবাই মিলে বসলেন ডাইনিং হলের একটি টেবিলে। প্রথমেই এল জলজিরার শরবত।

দেবলীনা সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, এখানে বুঝি কোনও উল্কা পড়েছে? কিংবা চাঁদের পাথর চুরি গেছে?

সন্তু বলল, সেসব কিছু না। স্রেফ বেড়াতে এসেছি। আমার বন্ধু জোজোকে বোধ হয় তুমি আগে দেখনি?

দেবলীনা বলল, এই-ই জোজো? এ কি তোরই মতন ক্যাবলাকান্ত?

জোজো বলল, আমি আরও বেশি ক্যাবলা! দেবলীনা বলল, তোমার মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। বলো তো মানুষ কতটা লম্বা হয়?

শৈবাল কাকাবাবুকে বললেন, দেখছেন আমার মেয়ের কাণ্ড? কীভাবে কথা বলে? সন্তু কেন যে ওকে চাঁটি মারে না!

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, দেবলীনার কাছে সন্তু জব্দ!

দেবলীনা জোজোকে খোঁচা মেরে বলল, বলতে পারলে না, মানুষ কত লম্বা হয়? এ তো সোজা! সব মানুষই সাড়ে তিন হাত।

জোজো বলল, যাঃ! এক-একজন মানুষ এক-একরকম। কেউ খুব বেঁটে, কেউ লম্বা!

দেবলীনা বলল, সাধে কি আর বলেছি ক্যাবলাকান্ত! নিজের হাতে মাপলে সবাই সাড়ে তিন হাত। বেঁটে লোকের হাত ছোট, লম্বা লোকের হাতও বড়।

দাড়িওয়ালা, মাথায় পাগড়ি পরা লোকটি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে এই টেবিলের দিকেই তাকিয়ে আছে। শৈবাল হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকলেন।

তারপর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হোটেলের মালিক ধরমবীর সিং। ইনি ছোটবেলা বিলেতে মানুষ হয়েছেন, আর ইনি রাজা রায়চৌধুরী, এঁর পরিচয়..কী বলব।

কাকাবাবু টেবিলের তলায় পা দিয়ে শৈবালকে একটা খোঁচা দিয়ে থামবার ইঙ্গিত করে বললেন, আমি একজন রিটায়ার্ড লোক, এমনিই বেড়াতে এসেছি।

কাকাবাবু আর ধরমবীর পরস্পরের দিকে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর ধরমবীর ইংরিজিতে বললেন, ওয়েলকাম টু মাই হোটেল। আশা করি, আপনাদের এখানে ভাল লাগবে।

কাকাবাবু বললেন, আমিও তাই আশা করি। আপনার এখান থেকে গাড়িভাড়ার ব্যবস্থা করা যাবে?

ধরমবীর বললেন, হোটেলেরই নিজস্ব গাড়ি আছে। চাইলেই পাবেন। আর বিশেষ কথা হল না। খাবার এসে গেল।

দেবলীনা সন্তুকে বলল, পাহাড়ের ওপাশটায় একটা গুহা আছে। দেখতে ভুলিস না।

জোজো জিজ্ঞেস করল, গুহাটাতে কী আছে?

দেবলীনা বলল, গুহার মধ্যে আবার কী থাকবে? জলহস্তী? গুহা তো গুহাই! অনেকটা লম্বা।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তুই ভেতরে গিয়েছিলি? শেষ পর্যন্ত?

দেবলীনা বলল, না, সবটা যাইনি। তুই থাকলে যেতাম। একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ভয় করছিল!

কাকাবাবু বললেন, দেবলীনাও তা হলে ভয় পায়?

দেবলীনা বলল, আমি চোর-ডাকাতকে ভয় পাই না। ভূতের ভয় পাই না। বাঘ-ভালুককেও ভয় পাই না। শুধু মাকড়সা..যদি ভেতরে বড় বড় মাকড়সা থাকে।

জোজো বলল, ট্যারান্টুলা। তুমি ট্যারান্টুলা দেখেছ? রাক্ষুসে মাকড়সা, আমি দেখেছি, সাউথ আমেরিকায়, আমাজন নদীর ধারের জঙ্গলে, একঝাঁক, ওদের সামনে পড়লে

মানুষ বাঁচে না! ওরা গুলি করলে মরে না, ছোরা দিয়ে কাটা যায় না। আমি বুদ্ধি করে একটা স্প্রে গান নিয়ে গিয়েছিলাম, তা দিয়ে ওদের গায়ে ছিটিয়ে দিলাম কেরোসিন, ওদের খুব প্রিয় খাদ্য কেরোসিন, মাকড়সাগুলো চেটে চেটে কেরোসিন খাচ্ছে, আমি একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে ছুড়ে দিলাম ওদের দিকে। ব্যস!

দেবলীনা সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, এই ছেলেটা খুব গুল মারে, তাই না?

সন্তু হাসি চেপে বলল, না, জোজো অনেক দেশ-বিদেশে ঘুরেছে।

দেবলীনা বলল, ও পকেটে দেশলাই রাখে কেন? বিড়ি খায় বুঝি?

শৈবাল ধমক দিয়ে বললেন, এই খুকি, কী হচ্ছে কী! চুপ কর!

কাকাবাবু বললেন, ওর চটাস চটাস কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

শৈবাল বললেন, মেয়েটা আমার পাগল একেবারে!

দেবলীনা বলল, আমি পাগল? পাগল বুঝি ফার্স্ট হয়?

জোজো সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ হয়। পাগলামিতে ফার্স্ট!

সন্তু হাততালি দিয়ে বলল, এইবার জোজো একখানা ভাল দিয়েছে?

দেবলীনা উঠে পড়ে বলল, আমি হাত ধুয়ে আসছি।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, তুই ওর সঙ্গে যা। ও মেয়েকে বিশ্বাস নেই। হঠাৎ দৌড় মারতে পারে।

শৈবাল বললেন, যা বলেছেন। এর মধ্যে আরও একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল জানেন তো?

কাকাবাবু বললেন, এই নিয়ে চারবার হল?

শৈবাল বললেন, হ্যাঁ, চারবার। আগেরবার আপনি উদ্ধার করেছিলেন। এবারেও আপনাকে খবর দেব দেব ভাবছিলাম, তখনই খবর পেলাম আসানসোল স্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

একটু পরে দেখা গেল, সন্তু দেবলীনার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। কাছে এসে বলল, হোটেল থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।

দেবলীনা কাকাবাবুর কাছে এসে তাঁর বুকে মাথা রেখে বাচ্চা মেয়ের মতন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কী করি বলো তো? আমার ছোটমাসিকে দেখতেও খুব ইচ্ছে করছে, আবার তোমাদের সঙ্গে থাকতেও ইচ্ছে করছে খুব!

কাকাবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, পাহাড় তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আবার আসা যাবে। মাসি তোমায় দেখতে চেয়েছেন, যদি পরে দেখা না হয়?

কাঁদতে কাঁদতেই দেবলীনা গাড়িতে উঠল। কাকাবাবুরা বাইরে এসে বিদায় জানালেন।

ওদের গাড়ি ছাড়বার পর জোজো বলল, বাপ রে, চলে গেছে, বাঁচা গেছে। যা বিচ্ছু মেয়ে!

কাকাবাবু বললেন, অল্প বয়েস থেকে ওর মা নেই। তাই খানিকটা জেদি আর খেয়ালি। কিন্তু পড়াশুনোয় দারুণ ভাল। সাহসও আছে খুব।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, ধরমবীর সিং এই হোটেলের মালিক। একে আমরা আগে কোথায় দেখতে পারি?

কাকাবাবু বললেন, বেশ জটিল ব্যাপার। আজ রাতটা কাটুক। কাল সকালে ভাল করে খোঁজখবর নিতে হবে। যদিও, এতে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু কৌতূহল না মিটিয়ে যেতে পারছি না।

ওপরে যে দুখানা ঘর দেওয়া হয়েছে, তা পাশাপাশি নয়। বারান্দার দুই কোণে দুটো। মাঝখানের ঘরগুলো বন্ধ।

কাকাবাবু বললেন, কোণের ঘরই ভাল। দুদিক দেখা যায়। তোদের কোনটা পছন্দ, বেছে নে।

সন্তুরা দুটো ঘরই দেখে নিয়ে ডান দিকেরটায় ঢুকে পড়ল।

কাকাবাবু নিজের ঘরে এসে পোশাক বদলালেন। ঘরটি বেশ বড়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জানলা খুলে একবার বাইরেটা দেখে নিলেন। একটা পাহাড়ের চূড়ায় বরফের ওপর জ্যোৎস্না পড়েছে। সেই জ্যোৎস্নার রং যেন অনেকটা নীল। তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

খানিকক্ষণ বই পড়ার পর শুয়ে পড়লেন কাকাবাবু।

সামান্য একটু খুট খুট শব্দেই একসময় ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। বাইরে থেকে কেউ চাবি দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছে।

বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা নিয়ে তিনি বিছানা থেকে নামতে না নামতেই দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল। তিনজন লোক হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে এসে দাঁড়াল তিনদিকে। একজন আলো জ্বেলে দিল।

তখন দেখা গেল, তিনজনের হাতেই রিভলভার। তাদের মধ্যে একজন ধরমবীর সিং।

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, এই অবস্থায় গুলি চালিয়ে কোনও লাভ নেই।

ধরমবীর গম্ভীরভাবে বলল, ড্র দ্যাট গান!

কাকাবাবু রিভলভারটা ফেলে দিলেন বিছানার ওপর।

ধরমবীর কাছে এসে সেটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, পার্সে ভু ফ্রাঁসে?

কাকাবাবু ইংরিজিতে বললেন, শুনলে বুঝতে পারি। বলতে গেলে অসুবিধে হয়। তোমার যা বলার, ইংরিজিতেই বলো।

ধরমবীর বলল, তুমি আমার পেছনে লেগেছ কেন? আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি।

কাকাবাবু বললেন, আমিও তো তোমার ক্ষতি করিনি। শুধু একটা কৌতূহল মেটাতে এসেছি।

কীসের কৌতূহল?

একজন মানুষ কেন চেহারা বদলে অন্য মানুষ সাজে। কোন উদ্দেশ্যে? আমার মুশকিল হচ্ছে, আমার স্মৃতিশক্তি বড় বেশি। একবার কিছু দেখলে ভুলতে পারি না। তোমায় আগে কোথায় দেখেছি, সেটাই শুধু মনে রাখতে অসুবিধে হচ্ছিল।

এখন কৌতূহল মিটেছে?

হ্যাঁ। তুমি ধরমবীর সিং নও। এটা তোমার ছদ্মনাম, ছদ্মবেশ।

তুমি আমাকে আগে কোথায় দেখেছ?

আসলে আমি তোমাকে আগে কখনও দেখিনি।

কী উলটোপালটা বকছ! এই বললে, আগে দেখেছ। আবার বলছ দ্যাখোনি।

তোমাকে আগে দেখিনি। তোমার ছবি দেখেছি।

শুধু ছবি দেখে? আমাকে এই চেহারায় চেনা যায়? অসম্ভব। তুমি মিথ্যে কথা বলছ!

ছদ্মবেশ ধরে মানুষ অনেক কিছু বদলাতে পারে। কিন্তু চোখ দুটো বদলানো যায় না।

বটে? তুমি আমাকে কতটা চিনেছ, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এখন তোমার হাত দুটো বাঁধা হবে, বাধা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। তাতে সুবিধে হবে না। আমি গুলি চালাব।

ধরমবীরের ইঙ্গিতে অন্য দুজন কাকাবাবুর হাত, পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলল।

ধরমবীর এবার লোকদুটিকে বলল, তোমরা এবার গিয়ে ওই ছেলেদুটিকে বাঁধো। এর সঙ্গে আমি কথা বলছি।

লোকদুটি চলে যাওয়ার পর ধরমবীর একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, তোমার নাম রাজা রায়চৌধুরী, তোমার সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। সদ্য শুনেছি। তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা থাকার কথা নয়। কিন্তু আমি ছদ্মবেশ নিয়েছি, যাতে আমাকে অন্য কেউ চিনতে না পারে সেইজন্য। তাই তো? তবু যদি কেউ চিনে ফেলে, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমার উচিত। ঠিক কি না? অতএব তোমাকে মেরে ফেলতেই হবে।

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন, তুমি সত্যিই আমাকে চেনো না। এর আগে অনেকেই আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু কেউই পারেনি। তুমিও পারবে না।

ধরমবীর ভুরু কুঁচকে বলল, পারব না? এই রিভলভারে ছটা গুলি আছে। একটা গুলি খরচ করাই যথেষ্ট। দেখবে?

কাকাবাবু বললেন, মরে গেলে আর দেখব কী করে? যাই হোক, তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো।

রিভলভারটা নামিয়ে ধরমবীর বলল, তোমার সাহস আছে, স্বীকার করতেই হবে। তোমার স্মৃতিশক্তিও অবিশ্বাস্য! এ পর্যন্ত একজনও আমাকে চিনতে পারেনি। শুধু ছবি দেখে তুমি আমাকে চিনেছ। ঠিক আছে, চিনতে পেরেছ ঠিকই। এবার কী করতে চাও?

কাকাবাবু বললেন, আর একটা কৌতূহল রয়ে গেছে। একজন লোক ছদ্মবেশ ধরে নিজের পরিচয় গোপন করে কেন? নিশ্চয়ই কোনও মতলব থাকে। তুমি নিশ্চয়ই এই হোটেল চালাবার জন্য ছদ্মবেশ ধরেনি। তার কোনও দরকার ছিল না। সেই উদ্দেশ্যটা জানার জন্য কৌতূহল হচ্ছে।

তুমি কী ভেবেছ, সেটা আমি তোমাকে বলে দেব?

না বললেও জানা যায়। অনেকটা আন্দাজ করতে পেরেছি।

শোনো মিস্টার রায়চৌধুরী, তুমি যাই-ই বলল, তোমাকে এক্ষুনি মেরে ফেলা শক্ত কিছু না। তারপর তোমার মৃতদেহটা কোনও একটা পাহাড়ের খাঁজে ফেলে রাখলে কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি মানুষ খুন করি না। তোমাকে মুক্তি দিতে পারি এক শর্তে, কাল ভোরবেলা তুমি সোজা দিল্লি চলে যাবে। আমার ব্যাপার নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করবে না।

বাঃ, তুমি যে এত সরল তা তো জানতাম না। তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে, আমি দিল্লি না গিয়ে যদি মাণ্ডি থেকে একদল পুলিশ নিয়ে ফিরে আসি?

তার জন্য জামিন রাখা হবে। তোমার সঙ্গে যে দুটি ছেলে আছে, তাদের একজনকে রেখে দেব। তোমরা দুজন দিল্লি যাবে। অন্য ছেলেটিকে তিনদিন পর আমরাই দিল্লি পৌঁছে দেব।

তাকে ফেরত পাওয়ার পর যদি পুলিশের কাছে যাই?

তখন পুলিশে খবর দিয়েও কোনও লাভ হবে না। ততদিনে দেখবে পাখি উড়ে গেছে! কী করবে ভেবে নাও। এক ঘণ্টা সময় দিলাম।

ধরমবীর বেরিয়ে গেল, কাকাবাবু বিছানার ওপর বসলেন।

হাতদুটো এমনভাবে বেঁধেছে, খোলার উপায় নেই। একবার তিনি ভাবলেন, এই ব্যাপারটায় নাক না গলালেই হত। এখানে না এসে এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়া যেত মানালি। কিন্তু স্বভাব যে যায় না। কোনও ব্যাপারে কৌতূহল হলে তা মেটাতেই হয়!

একটু পরেই ধরমবীর আর অন্য লোকদুটি ফিরে এল।

ধরমবীর বলল, তোমার এ-ঘরে থাকা হবে না। অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, হাত বাঁধা থাকলে আমি যাব কী করে? ক্রাচ ছাড়া আমি চলতে পারি না।

ধরমবীর বলল, তোমায় চলতে হবে না। ওরা দুজন তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবে!

কাকাবাবু এবার প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা ভেবেছ কী? আমি কি ছেলেমানুষ নাকি যে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে? হাত খুলে দাও, তোমরা যেখানে যেতে বলবে যাব!

ওদের মধ্যে একজন টাকমাথা তোক এক ঘুসি কষাল কাকাবাবুর মুখে। কাকাবাবুর নাক দিয়ে টপ টপ করে রক্ত পড়তে লাগল।

কাকাবাবু তার দিকে ফিরে ঠাণ্ডা কঠিন গলায় বললেন, তোমার মালিক। হুকুম দেওয়ার আগেই তুমি আমাকে মারলে কেন? আমার গায়ে কেউ হাত তুললে তাকে আমি শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। তুমিও শাস্তি পাবে!

লোকটি আবার মারবার জন্য হাত তুলতেই ধরমবীর তাকে বাধা দিয়ে বলল, ঠিক আছে, ওর বাঁধন খুলে দাও! রায়চৌধুরী, আশা করি, তুমি ভদ্রলোকের মতন আমাদের সঙ্গে আসবে, চ্যাঁচামেচি করবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা হল একতলায়। এখন কোনও ঘরে আলো জ্বলছে না। হোটেলের পেছনদিকের একটা দরজা দিয়ে বের হয়ে হাঁটতে হল এবড়োখেবড়ো রাস্তায়। ঠিক রাস্তাও নয়, বড় বড় পাথর ছড়ানো, অন্ধকার, কাকাবাবু কয়েকবার হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিলেন।

খানিক বাদে দেখলেন, এক জায়গায় আলো জ্বলছে।

সেটা একটা গুহার মুখ। হাতে হ্যাজাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। দেবলীনা কি এই গুহাটার কথাই বলেছিল?

গুহাটার মধ্যেও অনেকটা যেতে হল। মাঝে মাঝে আলো রাখা আছে। একটা জায়গা বেশ চওড়া, হঠাৎ যেন গুহাটার পেট মোটা হয়ে গেছে। সেখানে দুদিকে দুটো লোহার বেঞ্চ পাতা। একটাতে বসে আছে সন্তু আর জোজো, পাশে একজন রিভলভারধারী পাহারাদার। সেখানে দেওয়ালে একটা মশাল জ্বলছে।

ধরমবীর বলল, শোনো রায়চৌধুরী আমাদের এখন অনেক জরুরি কাজ আছে, তোমাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার সময় নেই। তুমি আর একটি ছেলে কাল ভোরে দিল্লি চলে যাবে। একটি ছেলেকে আমরা রেখে দেব। তুমি কোনও গণ্ডগোল না করলে, ছেলেটি দিল্লি পৌঁছে যাবে তিনদিন পরে। কোন ছেলেটি থাকবে? আচ্ছা, একেই রেখে দেওয়া যাবে!

সে জোজোর কাঁধে একটা চাপড় মারতেই জোজো সিঁটিয়ে সরে গেল।

সন্তু বলল, ওকে কিছু বলার দরকার নেই, যা বলার আমাকে বলুন!

ধরমবীর বলল, বেশ, তুমিই থাকো। তুমি চলো আমাদের সঙ্গে।

কাকাবাবু বললেন, সে প্রশ্নই ওঠে না। একজনকে রেখে কিছুতেই আমি যেতে রাজি নই। হয় তিনজনই একসঙ্গে যাব, অথবা তিনজনই থাকব।

ধরমবীর এবার গলা চড়িয়ে ধমকে বলল, তোমাদের সঙ্গে আমি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছি। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে তিনজনকেই সাবাড় করে দিত। আমি তোমার কথা শুনে বলব নাকি? এই ছেলেটাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

এই সময় আর-একজন লোক গুহার মধ্যে এসে ধরমবীরের কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগল।

তাকে দেখে চমকে উঠল এরা তিনজন। নৃপেন হালদার!

তার কথা শুনতে শুনতে ধরমবীর বলতে লাগল, গুড! গুড! এভরিথিং ইজ রেডি।

সে কথা শেষ করার পর নৃপেন কাকাবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, সার, এই আদমি ভেরি ডেঞ্জারাস হ্যায়। আর এই ছেলেটা, সন্তু, ভেরি বিচ্ছু। দয়ামায়া দেখাবেন না সার!

জোজো বাংলায় বলল, আপনি বাঙালি হয়ে আমাদের সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন?

নৃপেন ভেংচি কেটে বলল, ইস, বাঙালি! বাংলায় কেউ আমায় চাকরি দিয়েছে? ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমাদের এ ব্যাপারে নাক গলাতে

কে বলেছিল?

কাকাবাবু বললেন, চাকরি না পেলেই যদি কেউ খুনে-গুণ্ডাদের দলে যোগ দেয়, তা হলে সে বাঙালি না, বিহারি না, মাড়োয়ারি না, পাঞ্জাবি না, শুধুই একটা খারাপ লোক। চাকরি না করেও মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে!

নৃপেন বলল, চোপ! আবার বড় বড় কথা! আমাদের সাহেব ইচ্ছে করলেই তোমাদের এক্ষুনি খতম করে দিতে পারে।

ধরমবীর বলল, রায়চৌধুরী, ইংরিজিতে একটা কথা আছে, কিউরিয়েসিটি কি দ্য ক্যাট! বেশি কৌতূহল দেখালে অনেক সময় প্রাণ দিতে হয়। তোমরা যথেষ্ট কৌতূহল দেখিয়েছ। এখন থেকে আমি যা বলছি তাই শুনতে হবে। এই ছেলেটাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। চলো–

সে ইঙ্গিত করতেই রিভলভারধারী প্রহরীটি সন্তুকে জাপটে ধরল।

সন্তু ভালমানুষের মতন কয়েক পা গেল তার সঙ্গে। তারপরই হঠাৎ নিচু হয়ে লোকটির এক পা জড়িয়ে ধরে মারল এক আছাড়। তার হাতের রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল।

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, কাকাবাবু, ওটা ধরো।

কাকাবাবু সেদিকে ঝুঁকবার আগেই দুড়ুম করে শব্দ হল। ধরমবীরের রিভলভারের একটা গুলি কাকাবাবুর কাঁধ ঘেঁষে চলে গেল।

ধরমবীর বলল, এনাফ ইজ এনাফ! তোমাদের যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। এইটুকু ছেলে, এত ভাল ক্যারাটে জানে! কিন্তু আমার এখন এসব কথা বলার সময় নেই।

সন্তুর দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, বয়, যদি খোঁড়া না হতে চাও, আমাদের সঙ্গে চলো।

সন্তু কাকাবাবুর দিকে তাকাল, কাকাবাবু চোখের ইঙ্গিতে তাকে বোঝালেন, এখন আর বাধা দিয়ে লাভ নেই।

ধরমবীর কাকাবাবুকে বলল, এই গুহার উলটোদিকে বেরুবার কোনও পথ নেই। সামনের মুখটাও পাথর দিয়ে বন্ধ থাকবে। হাজার চ্যাঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। আমার শর্তে যদি রাজি না হও, তা হলে এখানেই না খেয়ে পচে মরবে! কাল ভোরে আমি একবার আসব। শুভরাত্রি, আ রেভোয়া!

সন্তুকে ওরা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলে গেল।

৭. কাকাবাবু আর জোজো মুখোমুখি

বেশ কিছুক্ষণ কাকাবাবু আর জোজো মুখোমুখি বসে রইল চুপ করে।

তারপর কাকাবাবু দুহাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, সবকিছুরই একটা ভাল দিক থাকে। এরা আমাদের হাত-পা বাঁধেনি। বাঁধতেও তো পারত। তার মানে, এরা ঠিক ডাকাত নয়, অন্য কিছু। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারও নয়, মশাল জ্বলছে। ক্রাচদুটোও দিয়ে গেছে দেখছি।

জোজো বলল, এরা খেতে দেবে কি? খিদে পাচ্ছে!

কাকাবাবু বললেন, সে কী! এর মধ্যেই খিদে পাবে কেন, আমরা তো রাত্তিরের খাবার খেয়ে নিয়েছি।

জোজো বলল, ও তাই তো। ভুলে গিয়েছিলাম। সকালে ব্রেকফাস্ট দেবে?

কাকাবাবু বললেন, এতবড় হোটেল, দেওয়াই তো উচিত! জোজো, তুমি গুহার মুখটা দেখে এসো তো, সেখানে কী অবস্থা?

জোজো দৌড়ে চলে গেল। ফিরে এল একটু পরেই। মুখটা বিবর্ণ।

সে বলল, কাকাবাবু, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। মুখটা একেবারে বন্ধ। আমরা যে ভেতরে আছি, তা বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারবে না। কী হবে?

কাকাবাবু বললেন, অত ঘাবড়াবার কী আছে! বাংলায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। যতক্ষণ নিশ্বাস পড়ে, ততক্ষণ আশা ছাড়তে নেই। সন্তু তো বাইরেই আছে। সে কি আমাদের ভুলে যাবে?

জোজো বলল, সন্তু লোকটাকে কী জোর আছাড় মারল! ইস, সেই সময় যদি রিভলভারটা তুলে নেওয়া যেত!

কাকাবাবু বললেন, সিনেমায় এসব খুব সহজ মনে হয়। কিন্তু এইসব ক্রিমিনাল, তারা কি বোকা? তারা সবসময় তৈরি থাকে। ওই লোকটা এমন গুলি চালাল, আমার কাঁধের কাছে ছুঁয়ে গেছে। ও ইচ্ছে করলে আমার বুকেও মারতে পারত!

আচ্ছা কাকাবাবু, ওই লোকটা আসলে কে? আপনি তো ওকে চিনতে পেরেছেন?

তোমরা যে ওকে কেন চিনতে পারোনি, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। আমরা তো একই সঙ্গে ওর ছবি দেখেছি!

ছবি?

মণিকরণে একটা বাড়ির দেওয়ালে ওর ছবি সাঁটা ছিল, মনে নেই? সেই যে, একটা লোক হারিয়ে গেছে, যার সন্ধান পেলে দশ হাজার ডলার দেওয়া হবে। তা নিয়ে কত কথা হল।

কিন্তু সে-লোকটা তো বিদেশি। মানে, ক্যানেডিয়ান!

বিদেশিরা কি এদেশি সাজতে পারে না? আমাদের দেশের কত লোক তো সাহেব সাজে! বিদেশিরাও ভারতীয় সাজতে পারে!

এখানে আসার সময় সন্তু বলছিল বটে যে, ধরমবীর সিংকে ঠিক ভারতীয় মনে হয় না। ওর ইংরিজি অন্যরকম। আমি তখন বললাম, দেবলীনার বাবা তো জানিয়েই গেছেন যে, ধরমবীর সিং, ছোটবেলায় বিলেতে ছিল, তাই ইংরিজি তো অন্যরকম হতেই পারে।

ও বিলেতেও থাকেনি, ওর নামও ধরমবীর সিং নয়। ও ক্যানেডিয়ান। ওর নামটা মনে আছে?

কী যেন, কী যেন, চিরাক, তাই না?

কারও নাম দেখলে, ছবি দেখলে, ভাল করে লক্ষ রাখতে হয়। তুমিই তো বলেছিলে ওকে খুঁজে বের করে দশ হাজার ডলারের পুরস্কার নিতে হবে?

মনে পড়েছে। মনে পড়েছে, চার্লস চিরাক!

চিরাক নয়। শিরাক। তা হলে আর চার্লস হবে না, শার্ল! ফরাসি দেশের এক রাষ্ট্রপতির নাম ছিল শিরাক। ক্যানাডার একদিকেও অনেক ফরাসি আছে। সেইজন্যই আমার মনে হয়েছিল, শার্ল শিরাক যার নাম, সে নিশ্চয়ই ফরাসি ভাষা জানবে! লোকটির চোখ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। মেলার ভিড়ের মধ্যে আমি ইচ্ছে করে ওর গায়ে ঢলে পড়ে দু-একটা ফরাসি ভাষায় কথা বলেছিলাম। জানো তো, মানুষকে হঠাৎ তার মাতৃভাষায় কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে, বা যে-কোনও কথা বললে সে মাতৃভাষাতেই উত্তর দেয়। তুমি পৃথিবীর যে-কোনও দেশেই যাও, হঠাৎ যদি কেউ বাংলায় তোমায় জিজ্ঞেস করে, তুমি কেমন আছ? তুমি সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেই উত্তর দেবে, ভাল! তাই না? আমার ফরাসি কথা শুনে ওই লোকটাও কিছু না ভেবেই ফরাসিতে উত্তর দিয়েছিল। একটু পরে খেয়াল হতেই পালিয়ে গেল। তখনই আমি বুঝে গেলাম, লোকটা আসলে কে!

ছবিটা তা হলে ও নিজেই লাগাবার ব্যবস্থা করেছে?

নিশ্চয়ই তাই। যাতে লোকের ধারণা হয় যে, ও মরেই গেছে। এতদিন পরে কেউ ওকে খুঁজবে না।

এরকম ছদ্মবেশ ধরার কী কারণ থাকতে পারে?

দুটো কারণ থাকতে পারে। হয় ও আগে কোনও বড় ধরনের অপরাধ করেছে, যেজন্য পুলিশ ওকে খুঁজবে। তাই চেহারাটা বদলে ফেলেছে। অথবা, ছদ্মবেশ ধরে ও সাঙ্ঘাতিক কোনও কাণ্ড করে আবার সাহেব সেজে যাবে। যতদূর মনে হচ্ছে, মাণ্ডির জেলখানা ভাঙার

ব্যাপারের সঙ্গে ওর কোনও যোগ আছে। জেল থেকে যারা পালিয়েছে, তাদের অধিকাংশই বিদেশি!

কাকাবাবু একটা হাই তুললেন। তারপর বললেন, অনেক রাত হল, এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

জোজো বলল, এই অবস্থায় আপনার ঘুম আসবে?

কাকাবাবু বললেন, আমি দুটো জিনিস মানি। এইরকম অবস্থায় পড়লেও সামনে যদি কিছু খাবার থাকে, খেয়ে নেবে। আর হাতে সময় থাকলে ঘুমিয়ে নেবে। কেন না, পরে খেতে পাবে কি না, ঘুমোতে পারবে কি না, তার তো কিছু ঠিক নেই। এখন তো কিছু দরকার নেই, ঘুমনোই ভাল।

কাকাবাবু কোটটা খুলতে গিয়ে চমকে গেলেন। একটা পকেট চাপড়ে বললেন, আরে! নরেন্দ্রর মোবাইল ফোনটা রয়ে গেছে। ফেরত দিতে ভুলে গেছি। নরেন্দ্রও চায়নি। এটাতেই তো খবর দেওয়া যায়।

তিনি ফোনটা চালু করে বোতাম টিপলেন। তার কাছে চারটে নম্বর আছে।

জোজো ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইল। তার মুখে হাসি ফুটেছে। নরেন্দ্র ভার্মাকে খবর দেওয়া গেলে আর কোনও চিন্তা নেই। এই ফোনগুলো কী দারুণ কাজে লাগে!

কাকাবাবু সবকটা নম্বর টিপলেন। কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বাজলই না। তিনি বললেন, যাঃ, এ কী হল! কিছু শোনা যাচ্ছে না।

জোজোর মুখ আবার শুকিয়ে গেছে। সে আস্তে-আস্তে বলল, একটা বিশেষ এলাকার বাইরে চলে গেলে এই ফোন কাজ করে না।

কাকাবাবু বললেন, তা হতে পারে। অনেকে রাত্তিরবেলা বন্ধ করে রাখে। দূর ছাই! ওরা আমার রিভলভারটা কেড়ে নেওয়ার পরে আর পকেট সার্চ করেনি। এই ফোনটা থেকেও কোনও লাভ হল না।

জোজো বলল, ওরা আমার পকেটও সার্চ করেনি। আমার কাছে একটা ছুরি আছে।

জোজো সেটা পকেট থেকে বের করে দেখাল, ছোট ছুরি।

কাকাবাবু বললেন, ওইটুকু ছুরি দিয়ে তো পাথর কাটা যাবে না। তবু যা হোক একটা অস্ত্র সঙ্গে রইল!

এর পর কাকাবাবু বেঞ্চে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুমও এসে গেল।

কয়েক ঘণ্টা পরে তার ঘুম ভেঙে গেল মানুষের গলার আওয়াজ শুনে। কেউ যেন তাকে ডাকছে, রাজাবাবু, রাজাবাবু, উঠুন!

মশালটা নিভে গেছে এর মধ্যে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। ডাকটা কোনদিক থেকে আসছে, বোঝা যাচ্ছে না।

আবার কেউ ডাকল, রাজাবাবু, শিগগির উঠুন!

শব্দটা আসছে গুহার ছাদের দিক থেকে।

কাকাবাবু বললেন, কে?

সে বলল, আমি নৃপেন। আমি একটা দড়ি ফেলে দিচ্ছি, সেটা ধরে ওপরে উঠে আসুন।

কাকাবাবু বললেন, কেন, ওপরে উঠব কেন?

নৃপেন বলল, এই গুহা থেকে বেরুবার আর কোনও উপায় নেই। সামনের মুখটা বন্ধ। এইদিকে উঠে এলে আপনারা বেঁচে যাবেন।

কাকাবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আমাদের বাঁচাবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কীসের? তুমি তো একটা বিশ্বাসঘাতক ছুঁচো। ওদের দলে যোগ দিয়েছ। আমাদের ওখানে তুলতে চাইছ কী মতলবে?

নৃপেন বলল, আমি সার পয়সার জন্য ওদের হয়ে কাজ করেছি। কিন্তু বাঙালি হয়ে কি বাঙালিদের মেরে ফেলতে পারি?

কাকাবাবু বললেন, অনেক বাঙালিই বাঙালিকে মারে। পয়সার লোভে মানুষ শয়তান হয়ে যেতে পারে।

নৃপেন এবার কাতর গলায় বলল, বিশ্বাস করুন সার, আমি আপনাদের বাঁচাতেই এসেছি। মা-কালীর দিব্যি! মা-দুর্গার দিব্যি। আমার নিজের মায়ের দিব্যি! দেরি করবেন না। তা হলে সব বানচাল হয়ে যাবে।

জোজোও এর মধ্যে উঠে বসেছে। কাকাবাবু হাতড়ে হাতড়ে দড়িটা ধরে ফেললেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, আমিই আগে উঠছি। জোজো, আমার ক্রাচদুটো তুমি তুলে দিয়ো।

দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে, গুহার দেওয়ালে পা রেখে রেখে উঠে এলেন ওপরে। গুহায় ছাদের একপাশে একটা মস্তবড় ফাটল, সেখান থেকে একটা মানুষ গলে যেতে পারে। তবে দড়ি না থাকলে এত ওপরে এমনি এমনি কারও পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়।

ওপাশে খানিকটা সমান জায়গা। সেখানে বসে আছে নৃপেন।

কাকাবাবু উঠে আসতেই সে কাকাবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন সার। লোভের বশে ওদের হয়ে কাজ করেছি। কিন্তু মানুষ মারাটারা... ওরে বাপরে বাপ, আমার দ্বারা তা কখনও হবে না। আপনি বিখ্যাত লোক, বাংলার গর্ব, আপনাকে

ওরা মেরে ফেলতে চাইলে আমি তা সহ্য করব? তবে সার, আপনি এই হোটেলে না এলেই পারতেন, তা হলে আপনাদের কোনও বিপদ হত না।

কাকাবাবু জোজোর জন্য দড়িটা নামিয়ে দিতে দিতে নৃপেনকে জিজ্ঞেস করলেন, ভূতেশ্বরের মূর্তিটা তুমিই চুরি করেছিলে?

নৃপেন জিভ কেটে বলল, আমি ঠাকুর-দেবতা চুরি করব! আমার পাপের ভয় নেই? ওটা ওরাই চুরি করিয়েছে। তবে কী জানেন, ওটা স্রেফ পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্য। মূর্তিটার দাম বড়জোর তিন-চার হাজার টাকা, তার জন্য এরা হাত গন্ধ করবে কেন? এই সাহেবদের কোটি কোটি টাকার কারবার। মূর্তিটা চুরি করা হয়েছিল, যাতে পুলিশ ওই নিয়ে ব্যস্ত থাকে!

কাকাবাবু বললেন, জেলখানার দেওয়াল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার খবর শুনে আমারও মনে হয়েছিল মুর্তি চুরিটা শুধু পুলিশকে ধোকা দেওয়ার জন্যই।

নৃপেন বলল, ওটা যে ফেরত দেওয়া হবে, সেটাও আগে থেকে ঠিক করা ছিল। ধরমবীর বলেছিল, ওটা একেবারে পুলিশের বড়কর্তার বাড়ির সামনে রেখে আসতে। আমিই ওদের বললাম, বরং মূর্তিটা রায়চৌধুরীবাবুর বারান্দায় পৌঁছে দাও। একই তো ব্যাপার। আপনি কেসটা নিয়েছিলেন, আপনার হাত দিয়ে উদ্ধার হলে আপনার সম্মান বাড়বে, বাঙালি হিসেবে আমি তো সেটাই চাই। তারপর আপনারা আজ সন্ধেবেলা মানালির দিকে রওনা দিলেন, আমি ভাবলাম, যাক, ঝামেলা চুকে গেল। এর মধ্যে যে আপনি আবার বাঘের গুহায় ঢুকে পড়বেন সাধ করে, তা কে জানত!

কাকাবাবু বললেন, তুমি মূর্তি চুরি করোনি, তা হলে তুমি এদের হয়ে কী কাজ করেছ? খবরাখবর দেওয়া?

নৃপেন বলল, তা খানিকটা করতে হয়েছে ঠিকই। তবে আসল কাজটা শুনলে আপনি নির্ঘাত অবাক হয়ে যাবেন। আমাকে সর্বমোট পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে, বারোজন সাহেবকে বাঙালি সাজিয়ে দেওয়ার জন্য।

কাকাবাবু সত্যিই অবাক হয়ে বললেন, বাঙালি সাজিয়ে দেবার জন্য? নৃপেন বলল, হ্যাঁ সার। জেল থেকে তো বারোজন সাহেব পালিয়েছে। এখন ওরা রাস্তায় বেরোলেই ধরা পড়বে। পুলিশ সব সাহেবের ছবি মিলিয়ে দেখছে। পাসপোর্ট দেখছে। তাই ওরা বাঙালি সেজে পালাচ্ছে। এখানে অনেক বাঙালি টুরিস্ট আসে, তাদের ভিড়ে মিশে গেলে কেউ ওদের সন্দেহ করবে না। পাসপোর্টও দেখতে চাইবে না। সবারই মুখে, হাত-পায়ে একটু একটু কালো রং মাখানো হয়েছে। ধুতি, পাঞ্জাবি আনিয়ে রাখা হয়েছিল আগে থেকে। শাল, মাঙ্কিটুপি, তাও জমা করা ছিল। এর আগে আমি দুজন অন্য সাহেবকে বাঙালি সাজিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি। তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। বাঙালি সাজা এই বারোজন কোনওরকমে বর্ডার পেরিয়ে নেপালে পালাবে।

প্রথমে ক্রাচদুটো, তারপর জোজোকে তুলে আনা হয়েছে। কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের ওই ধরমবীরই নাটের গুরু?

নৃপেন বলল, হ্যাঁ, সার, তারই তো সব প্ল্যান। দুমাস ধরে সব ব্যবস্থা হয়েছে। সবই তো ঠিকঠাক মিলে গিয়েছিল, যদি আপনি মাঝখানে এসে না পড়তেন! এখন এই পাহাড়ের উলটো দিক দিয়ে নেমে যান, বড় রাস্তায় গিয়ে পড়বেন, ভোর তো হয়ে এল। রাস্তায় গাড়ি পেয়ে যাবেন।

কাকাবাবু বললেন, নেমে যাব মানে? সন্তু কোথায়?

নৃপেন বলল, তাকে তো হোটেলের একটা ঘরে আটকে রেখেছে। হোটেলে ঢোকা এখন ডেঞ্জারাস ব্যাপার। সাহেবরা দুজন-তিনজন করে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, সন্তুকে না নিয়ে আমরা যাব নাকি?

জোজো বলল, কিছুতেই না। নৃপেন বলল, ঠিক আছে, আপনারা এগোন। আপনার তো নামতে সময় লাগবে। আমি দেখছি যদি ছেলেটাকে বের করে আনতে পারি। তাকে বোধ হয় তিনতলায় রেখেছে।

কাকাবাবু বললেন, শুধু তোমার ভরসায় ছেড়ে দিতে পারি না। আমাকেও যেতে হবে।

কাকাবাবু এগোতে শুরু করলেন।

একটু একটু করে আলো ফুটছে। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য দেখা যাচ্ছে না। হোটেলটা দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। কাকাবাবু জোজোকে বললেন, বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে চলো, যেন কেউ দেখতে না পায়।

হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে একজন লোক বেরিয়ে কী যেন ফেলে দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

কাকাবাবু দেওয়াল ঘেঁষে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর আবার এগোলেন সেই দরজার দিকে। নৃপেন এর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হাতে কোনও অস্ত্র নেই বলে কাকাবাবু খানিকটা অসহায় বোধ করছেন। আছে শুধু ক্রাচদুটো। সাবধানে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, কেউ নেই। ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

বারান্দাটা এখনও অন্ধকার। ডান পাশেই সিঁড়ি।

কাকাবাবু ফিসফিস করে জোজোকে বললেন, প্রথমে তিনতলাটাই দেখা যাক। কেউ যেন টের না পায়।

কাকাবাবুর ক্রাচের তলায় রবার বসানো, তাই ঠকঠক শব্দ হয় না। কিন্তু একটু না একটু শব্দ তো হবেই। তিনি উঠতে লাগলেন এক পা এক পা করে, থেমে থেমে।

সিঁড়ির বাঁক ঘোরার মুখেই একটা লোক একেবারে সামনা সামনি এসে গেল। তার হাতে বন্দুক। সেই বন্দুকটা তুলে গুলি চালাবার আগেই কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে তাকে মারলেন প্রচণ্ড জোরে।

লোকটা মাটিতে পড়ে গিয়েও বন্দুকটা ছাড়ল না। কাকাবাবু আবার মারলেন তার হাতে। এবারে লোকটা বন্দুকটা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে এসে গলা চেপে ধরল কাকাবাবুর। শুরু হল ধস্তাধস্তি।

লোকটা সিঁড়ির ওপরের ধাপে, কাকাবাবুনীচে, তাই লোকটার সুবিধে বেশি। সে কাকাবাবুকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। জোজো পেছনদিক থেকে এসে লোকটার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল। কাকাবাবু কোনওক্রমে বললেন, বন্দুকটা...

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুকে ছেড়ে বন্দুকটা তুলতে যেতেই কাকাবাবু একটা জোর লাথি কষালেন তার পেছনে। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কাকাবাবু আবার ক্রাচ দিয়ে মারলেন তার ঘাড়ে। লোকটা আর নড়ল না।

কাকাবাবু নিচু হয়ে তাকে উলটে দিয়ে নাকের কাছে আঙুল নিয়ে নিশ্বাস পড়ছে কি না দেখলেন।

তারপর বললেন, অজ্ঞান হয়ে গেছে। মরেনি। এ যে দেখছি সেই হু-হু বাবু!

জোজো বলল, তাই তো! আমি তখনই বলেছিলাম, ও পাগল নয়!

কাকাবাবু বললেন, ও থাক এখানে পড়ে! আর একটু হলে আমাকে ফেলে দিচ্ছিল আর কী!

বন্দুকটা হাতে নিয়ে খুশি হয়ে বললেন, অটোমেটিক রাইফেল! কাজে লাগবে।

ক্রাচদুটো নামিয়ে রেখে বললেন, আমাকে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হবে। ক্রাচ নিয়ে বন্দুক চালানো যাবে না। জোজো, তুমি একটা হাতে রাখতে পারো, লাঠির মতন ব্যবহার করবে।

দোতলায় উঠেই শুনতে পেলেন, একটা গাড়ির স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ। সামনের বারান্দা থেকে উঁকি মেরে কাকাবাবু দেখলেন, একটা স্টেশন ওয়াগন স্টার্ট নেওয়ার চেষ্টা করছে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালিবাবু, একজনের মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ।

জোজো বলল, কাকাবাবু, ওরাই সেই ছদ্মবেশী সাহেব। পালাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, আমি গুলি করে থামাতে পারি। কিন্তু ওরা যদি সত্যিকারের বাঙালি হয়? এ-হোটেলে অন্য কেউ আছে কি না তা তো জানি না। এমন সেজেছে, চেনাই যাচ্ছে না।

কাকাবাবু গাড়িটার চাকা লক্ষ্য করে গুলি চালালেন।

সঙ্গে সঙ্গে লোক তিনটি শুয়ে পড়ল মাটিতে। তাদেরও একজন গুলি চালাল বারান্দার দিকে।

কাকাবাবু জোজোকে নিয়ে দেওয়ালের আড়ালে বসে পড়ে বললেন, লড়াই শুরু হয়ে গেল। খুব সাবধান।

ঠিক তক্ষুনি তার কোটের পকেটে রুনুঝুনু শব্দ করে বেজে উঠল মোবাইল ফোন।

কাকাবাবু বললেন, আরে, এটা বাজছে দেখছি!

কানের কাছে নিয়ে শুনলেন নরেন্দ্র ভার্মার গলা। তিনি বললেন, গুড মর্নিং, রাজা। এত সকালে ঘুম ভাঙালাম? কাল রাত্তিরে ঠিক সময়ে মানালি পৌঁছে ছিলে তো? কোনও অসুবিধে হয়নি। সেই খবর নিচ্ছি।

কাকাবাবু বললেন, শোনো নরেন্দ্র, আমরা মানালিতে নেই। সেই রাস্তার মাঝপথে, একটা পাহাড়ের ওপর হিল ভিউ লজ হোটেল। এক গাড়ি পুলিশ নিয়ে সেখানে এক্ষুনি চলে এসো। জেলভাঙা কয়েদিরা সব এখানে রয়েছে। কাছাকাছি কোনও থানা থাকলে খবর দাও, যাতে তারা আগে চলে আসে। এক মিনিটও সময় নষ্ট করলে চলবে না। জীবন-মরণের প্রশ্ন। হারি আপ, প্লিজ হারি আপ!

দোতলার ঘরের একটা দরজা খুলতেই কাকাবাবু ফোনটা ফেলে সেদিকে একটা গুলি চালালেন। তারপর চেঁচিয়ে বললেন, কেউ কোনও ঘর থেকে এখন বেরোবেন না। বেরোলে তাঁর জীবনের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না।

অন্যদিকের একটা দরজার ফাক দিয়ে একজন মুখ বাড়াল। কাকাবাবু সেদিকেও একটা গুলি চালালেন।

একতলায় চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে।

কাকাবাবু এমন একটা জায়গায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন, যেখান থেকে দোতলার বারান্দাটা পুরো দেখা যায়, একতলার সিঁড়ি আর তিনতলার সিঁড়িও দেখা যায়। তলা থেকে কেউ উঠে এলে কিংবা ওপর থেকে কেউ নামতে চাইলেই গুলি খাবে।

ওপর থেকে কেউ এল না, কিন্তু একতলা থেকে দুজন উঠতে চেষ্টা করল একসঙ্গে। কাকাবাবু একঝাক গুলি চালালেন তাদের দিকে। তারা পিছু হটে গেল।

হঠাৎ দোতলার ঘরের একটা দরজা ঝট করে খুলে গেল, একজন লোক বেরিয়ে এসে একটা ছুরি ছুড়ে মারল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুর একটু দেরি হয়ে গেল, লোকটির

ছুরিটাই প্রথম এসে লাগল তার বা কাঁধে। কাকাবাবুর গুলি খেয়ে লোকটা ঘুরে পড়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, ইস, মরেই গেল নাকি লোকটা? আমি কাউকে একেবারে মেরে ফেলতে চাই না।

জোজো ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, কাকাবাবু, আপনার লেগেছে! রক্ত বেরোচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ লেগেছে বটে, কিন্তু অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মরব না।

জোজো বলল, পুলিশ কখন আসবে। আমরা কতক্ষণ লড়াই করব!

কাকাবাবু বললেন, যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। থামার তো উপায় নেই।

ছুরিটা কাঁধে গেঁথে আছে, একটানে সেটা তিনি তুলে ফেললেন। রক্ত বেরুল গলগল করে। পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে চেপে ধরলেন সেখানে।

তারপর বললেন, জোজো, তিনতলা থেকে কেউ নামবার চেষ্টা করেনি। ওখানে এদের কেউ নেই মনে হয়! একতলা থেকে কেউ ওঠবার চেষ্টা করলে আমি আটকাব। দোতলার ঘরের দরজা খুলে আর কেউ বেরুচ্ছে কি না তুমি ভাল করে লক্ষ রাখো।

কথা বলতে-বলতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে লাগলেন হোটেলের বাইরের গাড়িগুলো লক্ষ্য করে। সবকটা গাড়ির চাকা ফেঁসে গেল।

সেখান থেকেও একঝাক গুলি ছুটে এল, কিন্তু ততক্ষণে কাকাবাবু আবার বসে পড়েছেন। সন্তুষ্টভাবে বললেন, গাড়ি নিয়ে আর পালাতে পারবে না।

একটু আগে যে লোকটা গুলি খেয়েছে, সে মরেনি। উপুড় হয়ে কাতরাচ্ছে।

মিনিট পাঁচেক পরে আবার দুটো ঘরের দরজা খুলে গেল এক সঙ্গে। দুটো লোক বেরিয়ে এল, দুজনেরই হাতে দুটো ডাণ্ডা। কাকাবাবু এবার তৈরি ছিলেন, বন্দুকের নলটা মুহূর্তের মধ্যে ঘুরিয়ে দুজনকেই আহত করে দিলেন। তারা আবার ঘরে পালিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, সর্বনাশ!

জোজো বলল, কী হল?

কাকাবাবু বললেন, গুলি ফুরিয়ে গেল যে!

জোজো সাজ্ঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, অ্যাঁ এখন কী হবে? এখনও পুলিশ এল না।

কাকাবাবু বললেন, কত কাছে থানা আছে, তা তো জানি না। খবর পেয়ে তারা তৈরি হয়ে আসবে। এসে পড়বে আশা করছি।

জোজো বলল, নরেন্দ্রকাকাকে আবার ফোন করুন।

কাকাবাবু বললেন, আর ফোন করে কী হবে। এতক্ষণে তার বেরিয়ে পড়ার কথা। সন্তুর কী হল বুঝতে পারছি না। নীচের তলা থেকে নিশ্চয়ই কেউ আমাদের ওপর নজর রেখেছে। আমরা তিনতলায় উঠতে গেলে পেছনদিক থেকে গুলি চালাবে!

জোজো ছটফট করতে করতে বলতে লাগল, কখন পুলিশ আসবে? কখন পুলিশ আসবে!

কাকাবাবু বললেন, দোতলায় আর কেউ নেই মনে হচ্ছে। বাকি সবাই। একতলায়। এবার কি সত্যিই ধরা দিতে হবে। এবার ধরতে পারলে ওরা আর সময় নষ্ট করবে না।

কিছুক্ষণের জন্য সব চুপচাপ। তারপর একতলায় সিঁড়ির পাশ দিয়ে একটা রিভলভার সমেত হাত বেরিয়ে এসে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল দুটো। কাকাবাবু তার উত্তর দিতে পারলেন না বলে এবার মানুষটাও বেরিয়ে এল। ধরমবীর ওরফে চার্লস শিরাক।

এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে বলল, জানতাম, গুলি একসময় ফুরোবেই। এবার কী করবে রায়চৌধুরী?

কাকাবাবু মুখ তুলে দেখলেন, তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে নৃপেন আর সন্তু। নৃপেনের জামা রক্তে ভেজা, সন্তুরও কপালে লেগে আছে রক্ত। পাহারাদারের সঙ্গে খুব একচোট মারামারি হয়েছে বোঝা গেল।

ধরমবীরকে রিভলভার হাতে উঠতে দেখেই সন্তু আবার উঠে গেল তিনতলায়।

ধরমবীর বলল, রায়চৌধুরী, তোমার সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা ছিল। তোমাকে ছেড়েও দিতে চেয়েছিলাম। তবু তুমি শুধু শুধু মরতে এলে।

কাকাবাবু বললেন, যারা ক্রিমিনাল, তারা সব মানুষেরই শত্রু। তোমার সঙ্গীরা সবাই ধরা পড়েছিল, তুমি ছদ্মবেশ ধরে পুলিশের চোখ এড়িয়েছিলে। জেল ভেঙে তাদের উদ্ধার করার প্ল্যানও করেছিলে বেশ। সব ফেঁসে গেল তো!

ধরমবীর আর-এক সিঁড়ি উঠে এসে বলল, কিছুই ফাঁসেনি। শুধু তুমি ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে একটু দেরি করিয়ে দিলে। তুমি বলেছিলে, কেউ তোমাকে মারতে পারে না। এবার তোমায় কে বাঁচাবে?

কাকাবাবু বললেন, এখনও তো মারতে পারোনি।

ধরমবীর বলল, আগেরবার দয়া করেছিলাম। এবার আর দয়ামায়া নেই। আমি ঠিক তিন গুনব। এক, দুই-

ধরমবীরের আর তিন গোনা হল না। ওপর থেকে একটা চেয়ার এসে পড়ল তার মাথায়। তারপরই সন্তু রেলিং বেয়ে সরসর করে নেমে এল। ধরমবীর উঠে দাঁড়াবার আগেই সন্তু লাফিয়ে একটা জোড়া পায়ের লাথি মারল তার মুখে।

জোজোও নেমে গিয়ে একটা ক্রাচ দিয়ে ধড়াম ধড়াম করে পেটাতে লাগল তাকে।

কাকাবাবু বললেন, জোজো, ওর রিভলভারটা আমাকে দাও।

সেটা হাতে পেয়ে তিনি একই জায়গায় বসে থেকে বললেন, সন্তু, জোজো, এবার তোমরা সরে যাও।

ধরমবীর উঠে দাঁড়িয়ে অবাক ভাবে সন্তু আর জোজোকে একবার দেখল।

তারপর কাকাবাবুকে বলল, ওটা পেয়েও তোমার বিশেষ কিছু লাভ হবে। ওতে আর মাত্র চারটে গুলি আছে। তা দিয়ে তুমি কতক্ষণ লড়বে? তুমি কিছুতেই নীচে নেমে পালাতে পারবে না। অন্তত দশজন নীচে তোমার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

কাকাবাবু বললেন, আপাতত আমার নীচে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। তুমিও যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। নীচ থেকে অন্য কেউ উঠে আসার চেষ্টা করলে তোমাকেই প্রথম মরতে হবে!

ধরমবীর বলল, রায়চৌধুরী, তুমি কত টাকা চাও?

কাকাবাবু বললেন, একশো কোটি। দিতে পারবে?

ধরমবীর বলল, একশো কোটি? এ তো পাগলের মতন কথা। এক কোটি টাকাই এদেশে অনেক টাকা। তোমাকে এক কোটি টাকা দিতে পারি।

কাকাবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, মাত্র এক কোটি? ছছাঃ! অত সামান্য টাকা নিয়ে কী করব!

ধরমবীর বলল, তুমি যতই চালাকি করো, এখান থেকে তোমার বেরোবার কোনও রাস্তা নেই। আমাকে মেরে ফেললেও অন্যরা তোমায় ছাড়বে না!

কাকাবাবু বললেন, আমাকে নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার। খেলা শেষ। আজ থেকে তুমি আবার শার্লি শিরাক। তোমার জায়গা হবে। জেলে। আর বেশি ধৈর্য ধরারও দরকার নেই। জোজো দেখো তো, গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে মনে হল।

জোজো বাইরের দিকে উঁকি মেরে লাফাতে লাফাতে বলল, এসে গেছে! এসে গেছে! দুখানা পুলিশের গাড়ি!

৮. বিদেশি বারোজনের মধ্যে চারজন আহত

বিদেশি বারোজনের মধ্যে চারজন আহত, বাকিরা পুলিশের সঙ্গে একটুক্ষণ লড়াই চালাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেয়।

তাদের সবাইকে বন্দি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দুটি গাড়িতে। আর তাদের এদেশি শাগরেদ কয়েকজনকে হাতকড়া পরিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। হোটেলের সামনে।

নরেন্দ্র হোটেলের ফার্স্ট এইড বক্স আনিয়ে কাকাবাবুর কাঁধে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে দিতে বললেন, অনেক রক্ত বেরিয়েছে। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে কাত হয়ে পড়ত। তুমি দিব্যি হাসিখুশি আছো কী করে?

কাকাবাবু বললেন, ছুরিটা যদি আর ছ ইঞ্চি নীচে লাগত, তাতে আমার হৃৎপিণ্ডটা ফুটো হয়ে যেত। তা যে হয়নি, সেই আনন্দেই আমার কোনও যন্ত্রণার বোধ হয়নি!

নরেন্দ্র বললেন, তুমি পারোও বটে! এখনও চা খাওনি তো? আমিও চা খাওয়ার সময় পাইনি। এই হোটেলে এরা চা দেবে না? কুক, বেয়ারা, এরা তো আর চোর-ডাকাত নয়!

হোটেলের সাধারণ কর্মচারীরা ভয়ে কুঁকড়েমুকড়ে এক জায়গায় বসে ছিল। নরেন্দ্র তাদের ডেকে বললেন, তোমাদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখা হবে। কিছু গণ্ডগোল না থাকলে তোমাদের ভয়ের কিছু নেই। এখন আমাদের চা খাওয়াও।

একটু পরেই চা আর টোস্ট এসে গেল। নরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা রাজা, তুমি তো বলেছিলে এই জেলভাঙার কেসটা তুমি কিছুতেই নিতে চাও না। তবু মানালি না গিয়ে এখানে চলে এলে কেন?

কাকাবাবু বললেন, সে অনেক ব্যাপার আছে। নিয়তি, নিয়তি! কেন যে আমি এইসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি, নিজেই জানি না।

নরেন্দ্র বললেন, এবারে তুমি কী দারুণ কাণ্ড করেছ, তা তুমি সত্যিই এখনও জানো না। এই চার্লস শিরাক নামে লোকটা, একটা আন্তর্জাতিক কুখ্যাত ড্রাগ স্মাগলার। ভারতে বসে ছদ্মবেশে কারবার চালাচ্ছে, আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। ক্যানাডা, আমেরিকায় পুলিশের হুলিয়া আছে ওর নামে। ওখানকার পুলিশ আমাদের কাছে ওর সম্পর্কে জানতে চাইলে আমরা বলেছি, মিসিং, মিসিং। পাহাড়ে হারিয়ে গেছে। ওর সেই পোস্টারের কপি পাঠিয়ে দিয়েছি। ওই যে ধরমবীর সেজে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা তুমি না ধরতে পারলে কেউ বুঝতেও পারত না। পৃথিবীর সব কাগজে এ খবর ছাপা হবে। ভারত সরকার এজন্য তোমাকে পুরস্কার দেবে। তুমি তো টাকা-পয়সা নিতে চাও না, তাই একটা কিছু বিশেষ সম্মান...

কাকাবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, কে বলল টাকা-পয়সা নিতে চাই না? আমার বুঝি টাকার দরকার নেই? তোমরা দিতে চাও না, তাই মুখ ফুটে কিছু বলি না।

নরেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি এত পরিশ্রম করেছ, তার জন্য একটা ফি দেওয়া হবে। আর একটা বিশেষ পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করছি।

কাকাবাবু বললেন, সে পুরস্কার তোমরা জোজোকে দিয়ে। এবারে সবকিছুর জন্য জোজোরই কৃতিত্ব বেশি।

জোজো আর সন্তু দূরে অন্য একটা টেবিলে বসে আছে। কথাটা শুনে জোজো বলল, আমার আর সন্তুর। ভূতেশ্বরের মূর্তিটা তো আমরাই দুজনে উদ্ধার করে বারান্দা থেকে ঘরে এনে রেখেছি!

কাকাবাবু বললেন, চা খাওয়া হয়ে গেছে? চলো, আর দেরি নয়। এখনই মানালির দিকে রওনা হই। এরপর বিশুদ্ধ বেড়ানো।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ও, একটা কাজ বাকি আছে। যাদের হাতকড়া পরিয়ে বসিয়ে রেখেছ, তাদের মধ্যে টাকমাথা একজন লোক আছে। তাকে এখানে আনো তো! ও আমার নাকে ঘুসি মেরেছিল।

নরেন্দ্র বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি ওকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে চাও তো! দেখো রাজা, তোমার এক হাতে ব্যান্ডেজ, এখন তোমাকে গায়ের জোর ফলাতে হবে না। বরং আমি একটু হাতের সুখ করে নিই।

লোকটিকে সামনে আনার পর নরেন্দ্র বললেন, তুই এই সাহেবের নাকে নাকি ঘুসি মেরেছিলি, তাই না? দ্যাখ, নাকে ঘুসি খেতে কেমন লাগে!

দড়াম করে তিনি তার মুখে একটা ঘুসি কষালেন। লোকটির নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। লোকটি যন্ত্রণায় আঁ আঁ শব্দ করতে করতে বসে পড়ল মাটিতে।

নরেন্দ্র জোজোকে জিজ্ঞেস করলেন, কাকাবাবু ঘুসি খেয়ে ওরকম শব্দ করেছিলেন?

জোজো বলল, একটুও না।

নরেন্দ্র বললেন, জানি। পা খোঁড়া, কিন্তু অসম্ভব ওঁর মনের জোর। চলো, তোমাদের গাড়িতে তুলে নিই।

কয়েক পা যাওয়ার পর কিছু একটা মনে পড়ায় তিনি কোমরে দুহাত দিয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন খুব জোরে।

কাকাবাবু বললেন, এ কী, হঠাৎ হাসছ কেন?

নরেন্দ্র বললেন, সবকটা বিদেশি স্মাগলার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বাঙালি সেজেছিল! তোমাদের বাঙালিদের কীরকম সুনাম, বুঝে দ্যাখো!

কাকাবাবুও যোগ দিলেন সেই হাসিতে।